গণশিক্ষার স্বপক্ষে

সম্পাদনা

মধুসূদন চক্রবর্তী



বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
১২ই মে, ১৯৮২

প্রচ্ছদ :
শ্রীসুব্রত কুমার পাল

প্রকাশক :
কান্তি রঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৪/১, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রবন্ধ সূচী

ভূমিকা

বর্তমান সংকলনটির নাম "গণশিক্ষার স্বপক্ষে"। তবে কি "গণশিক্ষার বিপক্ষে" বলে কিছু আছে? এমন কেউ কি আছে, যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার চায় না; তার বিরোধিতা করে?

হ্যাঃ, আছে, অবশ্যই আছে! আরো বলা যায়—যতদিন সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত থাকবে, ততদিনই "গণশিক্ষার বিপক্ষে" বলার লোক থাকবে।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাবীদ ক্যালিনিন বলেছেন, "শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিক্ষা কখনোই শ্রেণী-নিয়ন্ত্রণের বাইরে বা উর্ধ্বে থাকতে পারে না।" এই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রবক্তা মার্কসের একটি বক্তব্য স্মরণীয়। মার্কস বলেছেন, "যে-শ্রেণী সমাজের বস্তুগত উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে আছে, সেই শ্রেণীই ঐ সুবাদে সমাজের মানসিক উৎপাদনের উপায়গুলিও দখল করে রাখে। ......যে-সব ব্যক্তি শাসকশ্রেণীর সভ্য তারা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অধিকারী হয় এবং সেই সুবাদে চিন্তা-ভাবনার কাজটিও করে।"

উপরোক্ত মন্তব্য দুটি থেকে বোঝা যায়—যুগে যুগে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতি শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিশেষ অধিকার হিসাবে বজায় ছিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজে, যেখানে শ্রেণী-ভেদ ছিল না সেখানে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সমাজের যৌথ অধিকার ছিল। সেখানে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনার কাজও চলতো সম্মিলিতভাবে। মানসিক-শ্রম ও কায়িক-শ্রমের মধ্যে বিভেদ ছিল না। সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে পড়লে এই বিভেদের সূচনা হয়, "পরিকল্পনাকারী মানুষ" আর "শ্রমকারী মানুষের" মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। প্রথমোক্তরা চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করার একচেটিয়া অধিকার দখল করে। আর শেষোক্তরা কেবল শ্রম দিয়ে প্রথমোক্তদের পরিকল্পনার বস্তুগত রূপ দেয় মাত্র, অর্থাৎ বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি করে। ফলে উৎপন্ন সম্পদ ক্রমেই পরিকল্পনাকারীদের সম্পত্তি হয়ে উঠে। আর সেই সুবাদে তারা শ্রমকারী মানুষকে শাসন ও শোষণ করে। কনফুসিয়াসের অনুগত একজন চৈনীক দার্শনিক বলেছিলেন, "যারা তাদের মন দিয়ে শ্রম করে তারা অপরকে শাসন করে, আর যারা শরীরের বল দিয়ে শ্রম করে তারা অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়।"

কোন একটি যুগের প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃতি ও তার শক্তিগুলি সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান না থাকলে শ্রমকারী মানুষ তার শ্রমশক্তিকে সার্থকভাবে উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারে না, শাসক ও শোষক শ্রেণী মাত্র ততটুকু জ্ঞানই তাদের দেয়।

দাস-ব্যবস্থার যুগে তাই ক্রীতদাসের জন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। সামন্ত-যুগে উৎপাদন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আবার ভূমিদাস ক্রীতদাসের চেয়ে কিছুটা স্বাধীন। সেখানে ভূমিদাসের কিছুটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা প্রয়াসের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই তাদের জমি, জলবায়ু, ঋতুভেদ, চাষের উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আর তা দেওয়া হতো প্রধানত মুখে মুখে ছড়া, আপ্তবাক্য, আর্য্যা ইত্যাদির সাহায্যে। কিন্তু সে যুগেও গণশিক্ষার প্রসার শাসক ও শোষক শ্রেণী কখনই চায়নি। কারণ "যে-কৃষক লিখতে পড়তে পারে, অশিক্ষিত কৃষকের চেয়ে তাকে ঠকানো অপেক্ষাকৃত কঠিন" (ডিডেরো)। তাই সেই যুগ থেকেই গণশিক্ষার প্রয়োজন ও চাহিদা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাব্য বিপদ এই দুই পরস্পর বিরোধী বিষয়ের দ্বন্দ্বের উদ্ভব দেখা দেয়।

পুঁজিবাদী সমাজে যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্তন ও প্রয়োগ শ্রমিকের কাছে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দাবি করে। তা ছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্যও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই প্রথম দিকে অশিক্ষিত অজ্ঞ সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে বুর্জোয়া শ্রেণীই শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজেও শিক্ষা-ব্যবস্থা বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। উন্নততর উৎপাদনের স্বার্থে মেহনতী মানুষকে, বিশেষতঃ শিল্প-শ্রমিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত কৃষি-খামারের খেতমজুরদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আবার এদের শিক্ষিত করে তুললে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ "শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা আনে বিপ্লব।"

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের (অবশ্যই বুর্জোয়া সরকারের—সঃ) কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে টলষ্টয় বলেছিলেন, "The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment."

বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টি শিক্ষাবিদ ক্যালিনিন এমনিভাবে দেখিয়েছেন—

"পুঁজিপতি চায় শ্রমিক ও কৃষক কোনরূপ প্রতিবাদ না করে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো শোষণের সমস্ত বোঝা বহন করবে। এই উদ্দেশ্য থেকে শুরু করলে পুঁজিপতিরা কখনই শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে উত্তম ও সাহস সঞ্চার করতে চাইতে পারে না, চাইতে পারে না তাদের কোন প্রকার শিক্ষা দিতে। কারণ অজ্ঞান ও দুর্দশাগ্রস্থ লোককে বাগে রাখা সহজ। কিন্তু এইসব লোকদের নিয়ে তো যুদ্ধ জয় করতে পারা যায় না, কারণ প্রাথমিক জ্ঞানবুদ্ধি না থাকলে সেই শ্রমিক তো যন্ত্র ও হাতিয়ার চালাতে পারে না। একদিকে যন্ত্রপাতির উন্নতি, অস্ত্রের জন্য প্রতিযোগিতা এবং অপরদিকে শিক্ষার সুযোগ লাভের জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করে শ্রমজীবী মানুষকে অন্তত কিছুটা পর্যন্ত জ্ঞান দিতে। আবার লুটেরা যুদ্ধের স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস ও অন্যান্য গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতেও তারা বাধ্য হয়, যদিও তা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক।

"কোন প্রকার বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাই এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না।

"আর তাই বুর্জোয়া সমাজ-চরিত্রে উল্লিখিত জন্মগত দ্বন্দ্বগুলি বজায় থাকা সত্বেও শাসকশ্রেণী সমস্ত প্রকারে জনগণের উপর আধিপত্য কায়েম রাখার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালায়, খোলাখুলি দমনমূলক উপায় থেকে শুরু করে ধূর্ত প্রতারণার মাধ্যমে।"

বুর্জোয়াশ্রেণী মেহনতী জনগণকে যে সামান্যতম শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ দিতে বাধ্য হয়, তাও করে খুবই সতর্কতা নিয়ে। শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনে, বিষয়বস্তু পরিবেশনে সব সময় লক্ষ্য রাখে যেন তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার মধ্যে বুর্জোয়া-স্বার্থের-পরিপন্থী কোন উপাদান গড়ে না ওঠে। কিন্তু এতৎসত্বেও বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা তার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায় না। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে গেলে পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন ক্ষেত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন।

ভারতীয় সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসও এইরূপ। ভারতীয় সমাজে বর্ণাশ্রমের মধ্যেই শ্রেণী-ভেদের প্রকাশ ঘটেছে। বৈদিক যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুটি উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৈশ্য,

শূদ্র ও বর্ণেতর আদিম অধিবাসীদের তাতে কোন অধিকার ছিল না। শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত, যা উচ্চবর্ণের পুরুষদের মধ্যে কথোপকথনেও ব্যবহৃত হতো। মহিলা ও নিম্নবর্ণের লোকেরা কথাবার্তা বলতো প্রাকৃত ভাষায়।

ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন ও অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল প্রধানত ব্রাহ্মণদের উপর, কখনো কখনো ক্ষত্রিয় শিক্ষকের উল্লেখও দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কোন বর্ণের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না। খোলাখুলিভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করা হতো। নীচ নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করার অপরাধে ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন নি। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও সূত বা সারথীর পুত্র বলে পরিচিত হওয়ায় মহাবীর কর্ণও দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

অন্ত্যজ কর্তৃক শাস্ত্রচর্চা সমাজের অমঙ্গলের কারণ বলে চিহ্নিত হতো। তাই ধর্মাশ্রয়ী রামরাজ্যে ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, তা হলো অন্ত্যজ শম্বুকের শাস্ত্রানুশীলন। তাই তার উপর রাজরোষ নেমে এল। প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র নিজহস্তে জ্ঞানপিপাসু পাতকীর মুণ্ডচ্ছেদ করে সমাজকে কলুষমুক্ত করলেন।

কিন্তু এই অবস্থা পরবর্তীকালে বজায় থাকে নি। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর অনুশাসন, জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ও দুরতিক্রম্য বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। আর তারই উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাব। বুদ্ধদেব ও মহাবীর সহজ সরল প্রাকৃত ভাষায় তাদের ধর্ম প্রচার করলেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতামুক্ত লোকায়ত ধর্ম মানুষের মন জয় করে নিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে বর্ণভেদের প্রতিবন্ধকতা সরে গেল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচণ্ড ঘা খেল।

এই ঘটনাকে যদি নিছক ধর্ম-বিপ্লব বলে দেখা যায় তবে ভুল করা হবে। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে মানুষের প্রধান উপজীবীকা ছিল শিকার ও পশুপালন। উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। তাই তার সঙ্গে সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির ততটা বিরোধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষি ও কুটির শিল্পের বিকাশের ফলে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হলো। বৈদিক যুগে বৈশ্য ও শূদ্রগণ অতি নিম্নমানের সামাজিক অধিকার ভোগ করতো। কৃষি ও কুটির শিল্পের বিকাশের ফলে তাদের--বিশেষ করে বৈশ্যদের—অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে তারা অধিকতর সামাজিক স্বীকৃতির জন্য উৎগ্রীব

হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তাদের সেই সুযোগ এনে দিল। ধর্মাচরণ ও শিক্ষায় সকল বর্ণের সমানাধিকার স্বীকৃত হলো। বৈদিক যুগের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠী, হস্তশিল্পী, ও বণিক সম্প্রদায় বেশি বেশি করে স্থান পেতে লাগলো। অন্যতম প্রধান পরিবর্তন দেখা গেল শিক্ষা ক্ষেত্রে।

(১) শিক্ষার পরিধি বেশ কিছুটা বিস্তৃত হলো।

(২) আচার্য ভিত্তিক আশ্রম-শিক্ষার স্থানে প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটলো।

(৩) শিক্ষার পাঠক্রমে ব্যবহারিক শিক্ষা সংযোজিত হলো।

(৪) ব্যাপক লোকায়ত শিক্ষার কাঠামো গড়ে উঠতে লাগলো।

(৫) উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য থেকে গেলেও লোকায়ত প্রাকৃত ভাষার স্থান শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনে ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো।

বর্ণভেদকে অস্বীকার করে, বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকারের নীতি ঘোষণা করে বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা উচ্চ শিক্ষা ও মৌলিক বৃত্তি-শিক্ষা ছাড়াও সর্বসাধারণের জন্য একটি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেছিল। এতৎসত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষের এক বিরাট অংশ—নিম্নবর্ণ ও বর্ণেতর সম্প্রদায়, শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনের বাইরেই থেকে যায়।

এ কথা ঠিক যে, সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে জৈন ধর্ম বেঁচে থাকলেও, বৌদ্ধধর্ম কিন্তু কার্যত তার জন্মভূমির মাটি থেকে ক্রমেই সরে যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিছুটা উদারতা নিয়ে আবার তার অধিকার ফিরে পায়। সাধারণ মানুষের জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছিল তা চলতে থাকে। বৈদিক যুগের আশ্রম-শিক্ষার স্থান ক্রমে প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক শিক্ষার দখলে চলে যেতে থাকে। সংস্কৃত ভাষা নির্ভর উচ্চ ও মধ্য শিক্ষা চলে টোল ও চতুষ্পাটিতে। আর সাধারণ মানুষের ভাষায় চলতে থাকে গ্রাম্য পাঠশালা ও পারিবারিক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি।

মুসলিম যুগে হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কিছুটা সংকোচিত হয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাদ্রাসা ও মক্তব প্রায় হিন্দু টোল ও চতুষ্পাটির পর্যায়ে পরিচালিত হতো, গ্রামীণ পাঠশালাগুলিও চলতে থাকে।

বৈদিক, বৌদ্ধ ও পরবর্তী হিন্দু ও মুসলমান—সব যুগেই শিক্ষা মূলত ধর্মকে আশ্রয় করেই এগিয়ে চলেছে। উচ্চ ও মধ্য শিক্ষা সমাজের উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগীদের অধিকারেই থেকেছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। তাই বলা হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন ও শোষণের ফলে ভারতে যে ব্যাপক গণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা ধ্বংস হয়েছে। আক্ষরিক দিক থেকে বিষয়টি সত্য হলেও, বিষয়টির অন্য আর একটি লক্ষণীয় দিক আছে।

ইংরেজরা এদেশে জাঁকিয়ে বসার ঠিক পূর্বে ভারতীয় সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাটা ছিল অনেকটা এইরূপ—দূরদূরান্তরে অবস্থিত কয়েকটি প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র বাদ দিলে গোটা ভারতীয় সমাজ ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন অসংখ্য স্বনির্ভর গ্রামের সমষ্টি। জনসংখ্যার প্রায় গোটাটাই ছিল কৃষির (চাষবাস, পশুপালন, কুটির-শিল্প ইত্যাদির) উপর নির্ভরশীল। আর সব রকম উৎপাদন কর্ম চলতো মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে—কাঠের লাঙলে চাষ, চরকায় সুতো কাটা, হস্তচালিত তাঁতে কাপড় বোনা, কামারশাল ও কুমোরের চাকে তৈরী হাতিয়ার ও বাসনপত্র ইত্যাদি। বন্যা, খরা জনিত অজন্মা লেগেই থাকতো। দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি, মহামারি, শিশুমৃত্যু ইত্যাদির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল নগণ্য।

প্রায় অপরিবর্তিত জনসংখ্যা, স্থিতিশীল জীবনযাত্রার মানসহ এইসব স্বনির্ভর গ্রামসমূহের উৎপাদন চলতো প্রায় সরল-পুনরুৎপাদনের স্তরে। কঠোরভাবে নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও অধিকারের সীমা ছিল সুনির্দিষ্ট। আর সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর বণ্টনও হতো তার উপর ভিত্তি করে; তাই তা ছিল কমবেশী পূর্বনির্ধারিত।

রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ছিল খুবই নির্লিপ্ত ও অসংবেদনশীল। রাজ্যের ভাঙাভাঙি, ভাগাভাগি নিয়ে গ্রামীণ সমাজ মাথা ঘামাতো না। গ্রামটি অখণ্ড থাকলেই হলো, গ্রাম সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ঘা না খেলেই হলো। দেশটা কোন শক্তির কাছে গেল, কোন সম্রাটের করায়ত্ব হলো তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ বা কৌতুহল ছিল না বললেই চলে। গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকতো।

ব্রিটিশপূর্ব যে সকল শক্তি ভারতে অভিযান চালিয়েছে বা এখানে রাজ্য স্থাপন করেছে তারা কখনো এই স্থিতিশীল গ্রামীণ ব্যবস্থাকে আঘাত করেনি,

বরং তা মেনে নিয়ে নিজেদের সেইমতো মানিয়ে নিয়েছে। তাদের সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের বোঝা গ্রামীণ মানুষের কাছে গুরুভার হলেও তা গোটা সমাজের কাঠামোটি ভেঙ্গে ফেলে নি। কারণ সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের চরিত্র, গভীরতা ও পরিমাণ সামন্ত-প্রভুদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস, খেয়াল-খুশী ও ভোগ-দ্রব্যের যোগানের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

এমনি একটি সমাজ-ব্যবস্থা ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল ভেঙে পড়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের প্রথম ধাক্কাতেই। যে শোষণের মূল চরিত্র হলো পুঁজিবাদী শোষণ, যার জপমালা হলো, মুনাফা, আরো মুনাফা। পুঁজিবাদী মুনাফার লোভ কোন কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে না, তাই তা হয় সীমাহীন।

এই শোষণের ফলে ভারতীয় স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোটি যেমন ভেঙ্গে পড়েছিল, তেমনি ভেঙ্গে পড়েছিল তার উপর নির্ভরশীল ভারতীয় সমাজের শিক্ষা কাঠামোটি। এই সময়কার বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ছিল তার একটি প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায় উইলিয়ম এডামের (১৮৩৫-৩৮) রিপোর্ট থেকে। এডাম পর পর তিনটি রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। তা থেকে জানা যায়,—শিক্ষা-ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা। সমাজের উচ্চবর্ণ ও সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষরাই কেবল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। সাধারণ মানুষের জন্য (তাও প্রধানত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না) ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল টোল আর মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল গ্রাম্য পাঠশালা বা পারিবারিক শিক্ষা-ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের কিছু কিছু হিন্দু সংস্কৃতের মাধ্যমে টোলে ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য ইত্যাদি পড়তো। আর অবস্থাপন্ন উচ্চস্তরের মুসলমানগণ মাদ্রাসাতে আরবি ও ফার্সীর মাধ্যমে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতো। উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রদের কোন খরচ বহন করতে হতো না। জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেদের দান ইত্যাদি থেকে টোল ও মাদ্রাসার খরচ চলতো।

সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। এতে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীকে সামান্য হলেও খরচ বহন করতে হোতো। সেখানে তারা মাতৃভাষায় পড়তে, লিখতে ও সামান্য হিসেব-নিকেশ করতে শিখতো। শিক্ষার বিষয় থাকতো

গতানুগতিক—যেমন জলবায়ু, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক গতি-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আবর্তন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান। তাও আবার পরিবেশন করা হতো খণার বচন, চাণক্য শ্লোকের মতো কিছু আপ্ত-বাক্যের সাহায্যে। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য গুণের নামতা, শুভঙ্করের আর্য্যা ইত্যাদির জ্ঞানই যথেষ্ট মনে করা হতো। ফলে তাদের মধ্যে গড়ে উঠতো কিছু কিছু সংস্কার, যা স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনঃসংস্কৃত না হওয়ায় কালক্রমে কুসংস্কার রূপে চেপে বসতো।

ফার্সী ছিল তখনকার সরকারী ভাষা। তাই সরকারী চাকুরীর স্বার্থে হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ ফার্সী পড়তেন, কখনও মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে, নয়তো ফার্সী শিক্ষক রেখে। মুসলমান শিক্ষকদের সঙ্গে হিন্দু ফার্সী-শিক্ষকও দেখা গেছে। ফার্সী ছাত্রদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বেশি পাওয়া গেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, স্থানীয় উৎপাদন ছিল প্রায় সরল-পুনরুৎপাদনের স্তরে। ফলে তা থেকে ইংরেজ বণিকদের প্রয়োজনমতো উদ্বৃত্ত পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের পুঁজিবাদী লুটের স্বার্থে এদেশে কাঁচামালের উৎপাদন এবং ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে জার্মানীর, অভিজ্ঞতায় ইংরেজরা জেনেছিল যে, শিল্পোৎপাদনের যুগে উৎপাদন ও চাহিদা উভয় ক্ষেত্রের বিকাশে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। তাই একদল ইংরেজ ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব তুলে ধরে। আর্থার ম্যাহু তার "এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখলেন—"দেশের বাস্তব সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য তালিম দেওয়ার কথাও উঠেছিল।[১] অন্য আর একটি বৃটিশ সরকারী দলিলে দেখা যায়—"আমাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং আমাদের দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা যা প্রচুরভাবে ব্যবহার করে এমন সব দ্রব্য-সামগ্রীর অধিকতর ও নিয়মিত যোগান সুনিশ্চিত করতে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শ্রমিকদের তৈরী জিনিসপত্রের চাহিদা অব্যাহত রাখতে" এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার করা প্রয়োজন।"[২]

১। 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক'—সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পৃঃ ১৩
২। ঐ

আমরা জানি বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার মতো বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাও নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়। তাইতো দেখি ১৭৯৩ সালে ইংলণ্ডের কমন্স সভায় যখন ভারতে মিশনারী পাঠানো এবং শিক্ষা-বিস্তারের প্রস্তাব এলো, তখন "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর বলেন, এই সেদিন আমরা আমেরিকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের উপনিবেশটা হারালাম, এখন আবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে ভারতটাকে সেইমতো হারানো চলবে না। এই বিরোধিতার ফলে প্রস্তাব তুলে নিতে হয়।"[১]

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখেছেন "ইংরেজের রাজ্যের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা নিষিদ্ধ ছিল। কোম্পানির ডাইরেক্টররা পাদরিদের ডরাতেন।"

অথচ এসব সত্বেও ১৮১৭ সালে শিক্ষাখাতে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। আবার সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে তা নিয়ে দেখা দিল নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারতীয় শিক্ষাবিদগণও প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী হিসাবে দুভাগ হয়ে জড়িয়ে পড়লেন। আর এরই সুযোগ নিয়ে ১৮৩৫ সালে মেকলে সুকৌশলে নানা বাগাড়ম্বর ও ভণ্ডামীর আড়ালে এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিশ করলেন যাতে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না।

প্রথমেই ঠিক হলো—সাধারণভাবে সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অর্থ যেহেতু সরকারের হাতে নেই, তাই এই টাকা কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। আর সেই শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরাজি। সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাসবাণী (!) উচ্চারিত হলো যে, এইসব নব্য-শিক্ষিত উচ্চবিত্তের লোকেরা ইংরাজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করে তা নিজস্ব মাতৃভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। এই সেই তত্ব যা "ডাউনওয়ার্ড ফিল্ট্রেসন থিওরী" বা "উপর থেকে চুঁইয়ে নামার তত্ব" বলে কুখ্যাত।

শ্রেণী-বিভক্তি সমাজে শাসক ও শোষক শ্রেণী যা চায় মেকলে সাহেব কার্যত তাকে রূপ দিয়েছেন মাত্র। কারণ তারা জানতো 'চুঁইয়ে নামার' যে তত্ব তারা দিয়েছেন তা কোন দিনই কার্য্যকরী হবে না। ভাওতা ও বাগাড়ম্বরের আড়ালে তারা শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সমাজের উপরতলার লোকেদের

১। 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক'—সৈয়দ শাহেদুল্লাহ—পৃঃ ১৩

মধ্যে আটকে রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর সাধারণ মানুষকে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার মধ্যে রেখে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের সহজ শিকারে পরিণত করার ব্যবস্থাটি পাকা করলেন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, তাদের এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতি বশংবদ এমন একটি এলিট শ্রেণী তৈরী করা যারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকের যোগান দেবে এবং ব্রিটিশ প্রভুদের জয়গান গাইবে। তারা স্পষ্টই বলেছে, "ইংরাজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যারা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতবাদ, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে খাঁটি ইংরেজ"। মেকলে সাহেব তার বাবাকে লেখা একটি পত্রে বলেছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে একজনও পৌত্তলিক থাকবে না। আর তা হবে কোন প্রকার ধর্মপ্রচার ছাড়াই।"

আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তারের তিক্ত অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খুব সাবধানতার সঙ্গে এদেশে একটি সংকীর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। তারা ভেবেছিল এই শিক্ষা ও তার সঙ্গে যুক্ত সরকারী চাকুরী ও লাভজনক পেশা শিক্ষিত লোকগুলিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে যুক্ত করে রাখবে। কিন্তু 'শিক্ষা আনে চেতনা'—এই সত্য বুর্জোয়া বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা রাখে না। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়-শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। যার প্রধান দাবিগুলি ছিল (১) বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা (৩) কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো জাতীয় শিক্ষা-পর্ষদ, আর সমসময়ে বিভিন্ন জায়গায় জাতীয়-বিদ্যালয়। আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় স্তরে একটি কাম্য শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিই অগ্রাধিকার পেল। বোঝা গেল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সফল রূপায়নের মতো জাতীয় শিক্ষা-আদর্শের সফল রূপায়নও স্বাধীনতা লাভের উপর নির্ভরশীল।

অবশ্য একথা ঠিক যে, জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন থেমে থাকেনি বা তা ব্যর্থও হয়নি। ইংরেজ সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল। রায়তওয়ারী অঞ্চলে খাজনার উপর শিক্ষা-সেস্ বসিয়ে প্রাথমিক

শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের অবস্থাটা ছিল স্বতন্ত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লীলাভূমি বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রবল। শিক্ষা-সেস দিতে জমিদার শ্রেণী অস্বীকার করলো। তাই একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বাংলা গভর্ণমেন্ট ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে একমত না হয়ে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শিক্ষা-কর বসানো অসম্ভব করেছে," ফলে বাংলা দেশে শিক্ষার প্রসার পিছিয়ে গেল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনীক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোন কোন গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই" (শিক্ষার সাঙ্গিকরণ)।

এই প্রসঙ্গে এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে, স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় সেই পিছটানই বোধ হয় কাজ করেছে। নইলে স্বাধীনতার মুখে যে পশ্চিমবাংলা শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বভারতীয় নিরিখে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল, আজ তা কী করে ত্রয়োদশ/চতুর্দশ স্থানে নেমে যেতে পারে? গত কয়েক বছর ধরে সরকারী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির অন্যতম বলে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

এরপর ১৯২৬ সালে যখন খসড়া প্রাথমিক শিক্ষা বিল বেঙ্গল কাউনসিলে এলো তখন সমস্ত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। খসড়া বিলে প্রস্তাব করা হলো প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে তা পূরণের জন্য খাজনার উপর টাকায় পাঁচ পয়সা হারে শিক্ষা-কর ধার্য্য করা হবে। সেই পাঁচ পয়সার মধ্যে এক পয়সা দেবে জমিদারগণ, আর চার পয়সা দেবে প্রজাগণ। অভাব, ঋণ ও দারিদ্র্য প্রপীড়িত প্রজাদের উপর করের এই বিরাট অংশ চাপানোর প্রস্তাব এমনিতেই অমানুষিক ছিল। তার উপর জমিদারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, প্রজার শিক্ষার স্বার্থে তাদের উপর কর আরোপ করা অন্যায়, তারা এই কর দেবেন না। গণশিক্ষা প্রসারের বিপক্ষে সেই প্রতিবাদ ধ্বনি! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জমিদারদের অনেকেই ছিলেন তখনকার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি, যে কংগ্রেস স্বাধীনতার পরবর্তী ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় শাসন চালিয়ে পশ্চিমবাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ রাজ্যে পরিণত করেছিল।

অবশ্য ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষ তার অধিকার সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হওয়ায় তারাও তাদের উপর করের বেশির ভাগ অংশ চাপানোর বিরুদ্ধে

সোচ্চার হয়। ফলে বিলটি কয়েকবার সিলেক্ট কমিটির হাত ঘুরে অনেক টাল বাহানার পর ১৯৩০ সালে আইনে পরিণত হয়। ঠিক হয়, জমিদারগণ দেবে দেড় পয়সা আর প্রজারা দেবে সাড়ে তিন পয়সা।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল। মানুষ এই আশায় বুক বেধে বসেছিল যে স্বাধীনতা পেলে তাদের বহুদিনের সব আশা পুরণ হবে, সেই সঙ্গে শিক্ষার অধিকারও সুনিশ্চিত হবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দীর্ঘ-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এলো। মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে দিন গুণতে লাগলো। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ করার পরেই ঘোষণা করলেন "শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে।" ১৯৫০ সালে সংবিধান রচিত হলো। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সাধারণ মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান প্রণেতারা অনেক কিছু ভাল ভাল কথা তাতে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশক নীতিতে সময় সীমা বেধে বলে দেওয়া হলো— সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬-১৪ বৎসরের প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে।

দশ বছরের জায়গায় ত্রিশ বছর পরও দেখা গেল শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বিপ্লব হলো না; সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থাই কার্যত বহাল রইলো, এখানে ওখানে কিছু প্রান্তিক রদবদল করে। সব চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই যে, স্বাধীনতার আগে ও পরে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও কমিশন জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয় বিকাশের স্বার্থে ব্যাপক গণশিক্ষা প্রসারের যে পরামর্শ দিয়েছিল এবং সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে যাকে জাতীয়-প্রতীজ্ঞারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, তার কোন সুরাহাই আজো হয়নি।

এই ব্যাপারেও পশ্চিমবাংলার নিষ্ক্রিয়তাই সবচেয়ে বেশি। বাধ্যতামূলক না হোক, অন্তত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষার কিছুটা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি রাজ্যই যখন করে ফেলেছে, তখনও পশ্চিমবাংলা তা করতে পারে নি। এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গোটা প্রাথমিক শিক্ষা তো বটেই, এমনকি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছে। উল্লেখ থাকে যে এর আগে পশ্চিমবাংলায় সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না।

শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার গণশিক্ষা প্রসারের এক ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়েছে। শিক্ষাকে অবৈতনিক করা ছাড়াও বিনামূল্যে বই, পোষাক, শ্লেট, খাতা, টিফিন এমন কি উপস্থিতি ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এতদিন বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত সম্প্রদায় এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অঞ্চলগুলির প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় নি। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সেই সব অঞ্চল চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে সেখানে অনেক নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

সেইসঙ্গে শিক্ষাকে সর্বত্রগামী ও সাধারণ মানুষের জীবন ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সুষ্ঠু ভাষানীতি ও একটি কার্যকরী পাঠক্রম চালু করেছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বামফ্রন্ট সরকারের সেই শিক্ষানীতি আজ আক্রান্ত। কিছু কিছু কায়েমীস্বার্থ ও তাদের তল্পীবাহক—সংখ্যায় তারা নগণ্য হলেও—তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এসব জনবিরোধী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এমন ভাবে কথা বলছেন, যেন তারা সাধারণ মানুষের কত না বন্ধু!

এর আগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি সমাজের উঁচু তলার লোকেরা নিচু তলার লোকদের খোলাখুলি বলে দিয়েছে, তোমরা অপাংক্তেয়, তোমরা অচ্ছুৎ, তোমাদের শিক্ষা সংস্কৃতিতে কোন অধিকার নেই। এমন কি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উপর প্রকাশ্য বিতর্কে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের পক্ষাশ্রয়ী প্রতিনিধি-বৃন্দ খোলাখুলি 'গণশিক্ষার বিপক্ষে' বক্তব্য রাখতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আজ কিন্তু আর তা করা যাচ্ছে না। আজ তাদের মুখোসের আড়াল খুঁজতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষের শুভানুধ্যায়ীর মুখোস। কারণ দীর্ঘ-গণতান্ত্রিক লড়াই-এর উত্তাপে পোড় খাওয়া মানুষ আজ আর এমনি প্রকাশ্য বিরোধিতাকে সহ্য করবে না। তাইতো দেখি, জমিদার-পুঁজিপতি স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্রীয় সরকার এক-দিকে যখন বল্গাহীন শোষণের রাস্তা প্রশস্ত করে দিচ্ছে, তখন "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ," "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" ইত্যাদি শ্লোগান তুলে মানুষের কাছ থেকে তাদের কুকর্মকে আড়াল করতে চাইছে। আবার এখানে বামফ্রন্ট সরকারের "গণশিক্ষার স্বপক্ষে" বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে এরা জনদরদী সেজে বাধা দিতে চাইছে সাধারণ মানুষের স্বার্থের অজুহাত তুলে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে,

জনসাধারণ এদের চেনে, এদের চরিত্র জানে, নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতায় দেখেছে সাধারণ মানুষের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক লড়াই-এর দিনে এরা কোথায় ছিল।

যাই হোক, বর্তমান সংকলনে আমরা পশ্চিমবাংলার কয়েকজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদের প্রবন্ধের মাধ্যমে "গণশিক্ষার স্বপক্ষে" যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য-নির্ভর যুক্তি তুলে ধরেছি তাতেই পাঠকগণ বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের অসারতা বুঝতে পারবেন আশা করি।

উপসংহারে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ও পাঠক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে দেখাতে চাই, কেন বিরুদ্ধবাদীরা গণশিক্ষার কর্মসূচীর বিরোধিতা করতে গিয়ে বিশেষ করে এই দুটি বিষয়কে, অর্থাৎ ভাষানীতি ও পাঠক্রমকে তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছে ?

প্রথমেই ধরা যাক ভাষার কথা : আমাদের উপরোক্ত আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, বৈদিক যুগে শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বা দৈনন্দিন কাজের ভাষা ছিল না। তারা কথা বলতো প্রাকৃত ভাষায়। তাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকায় শিক্ষা আবদ্ধ হয়েছিল সেইসব পরশ্রমভোগী উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যাদের হাতে এই দুরূহ ভাষাটি আয়ত্ত্ব করার জন্য যথেষ্ট উপায়, সময় ও অবসর ছিল।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধযুগে উচ্চশিক্ষার বাহন সংস্কৃত থাকলেও সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মের বাহন করা হয়েছিল প্রাকৃত ভাষাকে। যেহেতু সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমটি ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা দৈনন্দিন কাজের ভাষা তাই সাধারণ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্তর পরিধি নিয়ে। সেই শিক্ষা-ধারায় পরবর্তী কালে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যে সমাজের একটি বড় অংশে ছিল তা তো আমরা ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আগের অবস্থায় দেখেছি। আবার দেখেছি বিজাতীয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ আবার শিক্ষার অঙ্গন থেকে স্থানচ্যুত হয়েছিল। শিক্ষা মুষ্টিমেয় উপরতলার মানুষের বিশেষ অধিকার হয়ে পড়েছিল। তাই দেখা যাচ্ছে, যে-ভাষা মানুষের মুখের ভাষা, কাজের ভাষা, তার চিন্তা-চেতনার ভাষা সেই ভাষায় শিক্ষা পেলে সে সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।

তাই বামফ্রন্ট সরকার যখন ঘোষণা করলো যে প্রাথমিক স্তরে, অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়তে হবে না, তখনই এই ঘোষণার মধ্যে কায়েমী স্বার্থ তাদের বিপদের ছায়া দেখতে পেল। সরকারী পরিসংখ্যাণই বলে যে, প্রাথমিকস্তরে বিজাতীয় ইংরাজি ভাষা শিক্ষার বাধ্যবাধকতাই সাধারণ ঘরের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। এবার সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হলো। আরো যখন বলা হলো যে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীকে বৎসরান্তে একই শ্রেণীতে আটকে রাখা হবে না, তখনই তারা বুঝতে পারলো যে, এর ফলে সাধারণ মানুষের ঘরের এক বিরাট সংখ্যক ছেলেমেয়ে বেশি না হোক অন্তত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাটি বিনাআয়াসেই আয়ত্ব করে ফেলবে। ফলে "একজন অশিক্ষিত মানুষকে ঠকানোর চেয়ে একজন শিক্ষিত মানুষকে ঠকানো অনেক কঠিন" কথাটি কার্যে পরিণত হবে। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার শেষ অবশেষ যা এখনো পশ্চিমবাংলায় রয়ে গেছে তারা মরিয়া হয়ে একে রোখার চেষ্টা করবে এতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই।

তবে আশার কথা এই যে, বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকেও যে সামন্তশক্তি প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিল তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মাত্র আজ বেঁচে আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের বেশির ভাগই আজ সামন্ততান্ত্রিক জীবন-যাপন ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে কিছু কিছু এখনো পুরোণো দিনের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আবার এমন কিছু লোক আছেন যারা এইসব মেকি জনদরদীদের গোপন উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে পরিবর্তনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে এদের ফাঁদে পা বাড়ান। অপরদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য যারা এতদিন শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় নির্লিপ্তের জীবন কাটিয়েছে, তারা আজ গণসংগ্রামের কামারশালে শাণিত হয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে এগিয়ে আসছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়।

এইবার পাঠক্রমের দিকটা দেখা যাক: আমরা দেখেছি, বৈদিক যুগে তো বটেই, পরবর্তী যুগেও উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে বিষয় ছিল প্রধানত ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য-অলঙ্কার, পুরাণ ইত্যাদি। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সমাজের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তী বৌদ্ধ যুগে সাধারণ শিক্ষার বিষয় বস্তুতে সাধারণ মানুষের জীবন ও সমাজের প্রয়োজনীয়

উপাদান কিছু কিছু ছিল। তাই মানুষ উৎসাহ নিয়ে তা শিখেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের যুগে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে এখনো পর্যন্ত যা প্রায় আবিকৃত অবস্থায় চালু রয়েছে, তাতে শিক্ষা চাকুরী পাওয়া ও চাকুরী করার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের উপরে উঠতে পারে নি। অথচ শিক্ষা কখনোই মজুরি-দাস তৈরী করার হাতিয়ার নয়। উপরন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চাকুরীর সংখ্যা সীমিত হতে বাধ্য। তাই সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এই শিক্ষা নিয়ে বেকার বসে থাকতে বাধ্য হয়। তা দেখে সাধারণ মানুষ এই শিক্ষা নিতে উৎসাহ বোধ করবে না এটাই তো স্বাভাবিক।

তাই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে সকল মানুষের জীবন ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তিত পাঠক্রমের কথা বলেছে, এবং সেই মতো পাঠক্রমে সংস্কার সাধন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে চাকুরীমুখি না করে তাকে সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে যুক্তিপূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত করে তুলবে। একদিকে এই শিক্ষা যেমন তার মনে দাস্য-ভাবের বিকাশ না ঘটিয়ে তাকে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সার্থকভাবে যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, তেমনি অপর দিকে তারা বুঝতে পারবে প্রকৃতি ও সমাজের কোন বিরোধী শক্তি সমাজকে তার কাম্য লক্ষ্যে পৌছানোর পথে বাধা সৃষ্টি করছে এবং কিভাবে তা অতিক্রম করা যায়। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের যে-অংশ দীর্ঘদিন ধরে শ্রম-বিমুখ জীবন যাপন করে অভ্যস্ত, যাদের পিছুটান সমাজকে তার চিরাচরিত দুষ্টচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে বাধ্য করে, সেই শক্তি কী কখনো এমন ব্যবস্থা বিনা বাধায় মেনে নিতে পারে, যা সাধারণ মানুষের চোখ খুলে দেবে, তাদের সুপ্ত চেতনা ও উদ্যোগকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে? না পারে না। কারণ তারা তো সব সময় "গণশিক্ষার বিপক্ষে"। আর তারাই তো বারবার বলে এসেছে, "it is not necesrry to accentuate the intelligence of the rural people."

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে স্পষ্ট বুঝা যায় "গণশিক্ষার বিপক্ষে" বলার লোক কারা এবং কেনই বা তারা ভাষানীতি ও পাঠক্রমকে তাদের আক্রমণের প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সম্পাদক

বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য

শ্রীমতী অনিলা দেবী

একটি সরকার কি কি কর্মনীতি গ্রহণ করে এবং সেই নীতি কার্যকরী করতে কি কি কর্মোদ্যম অনুসরণ করে তা দিয়েই বিচার করা যায় সেই সরকার কার স্বপক্ষে, কাদের ভাল করা তার উদ্দেশ্য। এই নিরিখে বিচার করলে পশ্চিমবাংলার বামফ্রণ্ট সরকারের দু'টি কাজ আমার অন্ততঃ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এক, "বর্গা অপারেশন", দুই "গণশিক্ষা" প্রসারের প্রচেষ্টা। উভয় ক্ষেত্রেরই লক্ষ্য সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ অবহেলিত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

স্বাধীনতার পর থেকে যে বামপন্থী শক্তি অকৃত্রিমভাবে শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-খেতমজুর ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের সংগ্রামে সব সময় সক্রিয় থেকেছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, শাসন ক্ষমতায় এসে তারা যে সমাজের গরীব অবহেলিত ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নেবে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তা বলে এই দু'টি ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকার একটা বৈপ্লবিক কিছু করে ফেলেছে সে কথা বলার সময়ও এখনি আসেনি। কিন্তু এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছে তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ দূর করার নাম করে স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ আইন, উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন বিধি, ভাগচাষী-বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন ইত্যাদি অনেকদিন আগেই করা হয়েছে। ব্যাপক গণশিক্ষা প্রসারের কথাও মাথায় রেখে সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে বলা হয়েছে, —সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ১০ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬—১৪ বৎসরের প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন ও কমিটি অনেক ভাল ভাল সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে, সুপারিশও পেশ করেছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন সময়ে নীতিগতভাবে তা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতদিন সে-সব মন্তব্য ও কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্যে কোন সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। সাধারণ মানুষের জীবনে আঁধার কেটে আলোর আভাস বিশেষ দেখা যায় নি। নির্ধারিত নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে অন্ধ গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে।

সাধারণ মানুষের সহযোগী বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষত্ব এইখানে যে তারা জনকল্যাণকর সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়েছে। আর তার সব কর্মপ্রচেষ্টা চলছে সেই সাধারণ মানুষদেরই সাথে নিয়ে। সুতরাং গেল গেল রব উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উঠবেই।

আমরা জানি বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সবকিছু অন্যায় অবিচার নানা রকম বাগাড়ম্বর বা নীতিবাক্যের আড়ালে ঢেকে রাখাই প্রচলিত রেওয়াজ। ভাল ভাল কথা সংবিধানে আছে, ইতোপূর্বে আপাত সুন্দর আইনও হয়েছে, গঠিত বিভিন্ন কমিটি-কমিশন ভাল ভাল সুপারিশ করেছে, কিন্তু সে-সব কার্যকর করার প্রচেষ্টা হয়নি বললেই চলে। বামফ্রন্ট সরকারের সব চাইতে বড় অপরাধ—তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থে সেগুলি কার্যকর করতে প্রয়াসী হয়েছে। সবাইকে ডেকে সবকিছু জানিয়ে দিচ্ছে, আবার ডেকে বলছে—এস সবাই মিলে কাজগুলি করে ফেলি।

বংশপরম্পরায় যে কায়েমী স্বার্থ দেশের সাধারণ মানুষকে অশিক্ষা অজ্ঞতার মধ্যে রেখে নানাভাবে তাদের উপর শোষণ বঞ্চনার ষ্টিম রোলার চালিয়ে আসছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এতে সংকিত হয়ে উঠেছে! একজন ফরাসী দার্শনিক একবার বলেছিলেন, —একজন শিক্ষিত চাষীর চেয়ে একজন নিরক্ষর চাষীকে ঠকানো অনেক সহজ। তাই ব্যাপক গণশিক্ষার প্রসারের পটভূমিতে আধিয়ার-বর্গাদারদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে বিরাট মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে; ফলে যাদের দীর্ঘদিনের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে, তারা প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আমরা, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শিক্ষানীতিকে বিশেষভাবে বিচার করতে চাই।

শিক্ষার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংযোগ এবং শিক্ষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। শিক্ষা-আন্দোলনে যুক্ত থাকার দৌলতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী আলোচনা করার সুযোগ আমাদের হয়েছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে যে-সব শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশও আমরা সম্যক অবগত

আছি, উপরন্তু গোপালকৃষ্ণ গোখেল, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পূর্বসূরী শিক্ষা-নায়কদের শিক্ষা-চিন্তা ও শিক্ষা-দর্শন সম্বন্ধেও আমরা সচেতন। এছাড়া আমরা নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর স্থানীয়ভাবে বা সর্বভারতীয় স্তরে আলোচনা-চক্র, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করেছি এবং সেইসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজনের কথা বারে বারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বামফ্রন্ট সরকারের সুচিন্তিত শিক্ষানীতিতে সেই সবকিছুরই সার্থক প্রতিফলন রয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষা-ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ অর্থাৎ শিক্ষাকে গণমুখি করা। বিস্তারিতভাবে বললে তা দাঁড়ায়, শিক্ষাকে ব্যাপক জনগণের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, শিক্ষাকে গোটা সমাজের প্রয়োজন, চাহিদা ও আশা-আকাংক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ঢেলে সাজানো, শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রাসঙ্গিক করে তোলা, এবং সর্বোপরি শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন সুনিশ্চিত করা। এর জন্য ইতোমধ্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণকরা হয়েছে তার কয়েকটি হলো,—দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে সমস্ত পাঠ্য-পুস্তক ও কিছু কিছু শিক্ষোপকরণ এবং মধ্যাহ্নকালীন টিফিন ও পোশাক সরবরাহ করা, বিদ্যালয়বিহীন অঞ্চল চিহ্নিত করে সরকারী উদ্যোগে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, বর্তমান বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণ ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ তো গেল শিক্ষাকে ব্যাপক জনগণের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তব ব্যবস্থাবলী। সেইসঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু ভাষানীতি ও সুচিন্তিত পাঠক্রমও প্রবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী একদিকে যেমন শিক্ষার পরিধিকে প্রসারিত করতে সহায়ক হবে, অপরদিকে সেই শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর জীবন ও সমাজের আশা-আকাংক্ষা ও চাহিদা পূরণের উপযুক্ত হাতিয়ার। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বামফ্রন্ট সরকারের এই শিক্ষানীতি আজ আক্রান্ত। আর আক্রমণ আসছে প্রধানত পাঠক্রম ও ভাষানীতিকে লক্ষ্য করে।

নব পরিকল্পিত পাঠক্রমকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁরা একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু পাঠক্রমের ভূমিকায় কি আছে? সেখানে বলা হয়েছে, "মানব বিকাশের কয়েকটি দিক আছে, যথা—দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি। এই বিকাশ ধারা অনুসরণ করে বলা যায়, জ্ঞানার্জন, চিন্তন ও মননের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার মাতৃভাষা ও সাধারণ গণিত শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন, অনুভূতির সুষম বিকাশ, সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ গঠন, ব্যক্তিগত সামাজিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সু-অভ্যাস সমূহ গঠন—সর্বোপরি শোষণ-মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনের এবং তদনুযায়ী নিজ জীবন-চর্চায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।"

গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে কোটারী কমিশনের সর্বশেষ প্রতিবেদনের আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে এতে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় শিক্ষানীতির যে লক্ষ্য, উপাদান ও লক্ষণের কথা বলা হয়েছে তারই সঠিক সমাবেশ রয়েছে। এদের কেউ বামপন্থী ছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। যাক সে-সব কথা। যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন কিছুতে গলদ ধরতে বদ্ধপরিকর তাদের সঙ্গে ব্যর্থ বিতর্কে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই।

তার চেয়ে নবপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের বিশেষত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পাঠক্রম প্রণেতারা খুব সঠিকভাবেই পাঠক্রমকে চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন, যথা

১। খেলাধূলা ও শরীরচর্চা।

২। উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ।

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ।

৪। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ।

পঠন-পাঠন নির্ভর কাজকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) মাতৃভাষা শিক্ষা (খ) গণিত-শিক্ষা (গ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বর্তমান পাঠক্রম চিরাচরিত পাঠক্রম থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। এতদিন, বলতে গেলে, পুস্তক-নির্ভর পঠন-পাঠন ও নিয়ম-মাফিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নকেই শিক্ষার প্রধান কর্মধারা হিসাবে দেখা

হতো। কিন্তু বর্তমান পাঠক্রমে পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের সঙ্গে খেলাধূলা ও বিভিন্ন প্রকার বাস্তব কাজকর্মকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৎসরান্তিক পরীক্ষা-কেন্দ্রীক মূল্যায়নের বদলে ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে—"প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতেই কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-বর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজন বোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।"

চিরাচরিত পরীক্ষা পদ্ধতিকে বৎসরান্তে মূল্যায়নের নাম করে প্রতি শ্রেণীতেই বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে অনুপযুক্ত ছাপ দিয়ে সেই শ্রেণীতে আটকে রাখা হতো। ফলে দেখা যেতো প্রতি বছরই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বেশ কিছু শিক্ষার্থী পড়াশুনাই ছেড়ে দিতো। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি এই অপচয় সম্পর্কে বারে বারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রথম শ্রেণীতে পড়তে আসা ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০।৩৫ জন পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে। এ থেকে এই জাতীয়-অপচয়ের ব্যাপকতা অত্যন্ত প্রকট। আমাদের মনে হয় বর্তমান পাঠক্রমে প্রস্তাবিত মূল্যায়ন পদ্ধতি এই বিরাট জাতীয় অপচয় কিছুটা বন্ধ করতে সাহায্য করবে এবং গ্রাম-গঞ্জের পশ্চাৎপদ অংশের শিশুদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপকতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষা :

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম নাগরিক তৈরি করা। কথায় আছে, "সুস্থ দেহ সুস্থ মনের আধার"। ভারতবর্ষের মতো একটি উন্নয়নকামী দেশের বিরাট কর্মযজ্ঞের সফল রূপায়ণে সবল, সক্ষম, কর্মদক্ষ যাজ্ঞিকের প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান।

প্রশ্ন হতে পারে শিশুরা তো এমনিতেই সারাদিন নানাপ্রকার খেলাধূলা করে, তাতেই তো তাদের প্রাত্যহিক শরীর-চর্চার কাজ হয়ে যায়; এর জন্য আবার বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কাজ ব্যাহত করা কেন? এর উত্তর হলো, প্রথাগত শিক্ষার ধারা হলো বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ও সুশৃঙ্খলভাবে জ্ঞান ও কর্ম-চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতিতে কাম্য পরিবর্তন সূচিত করা। তাই শিক্ষার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত শরীর-চর্চা ও খেলাধূলাকে শিক্ষার

বিভিন্ন লক্ষ্যের আলোকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে পাঠ্যসূচীতে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ :

নব-পরিকল্পিত পাঠক্রমে এই বিশেষ ক্ষেত্রটি নতুন করে সংযোজিত হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য দুটি :

এক, শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমকারী মানুষ সম্পর্কে, সমাজ বিকাশে তাদের শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে শ্রম করার কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো।

মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি। তাই এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে করে তোলে শ্রমবিমুখ, চাকুরীমুখি। শিক্ষার চাকুরীমুখীনতা দূর করতে, শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে এই বিশেষ ক্ষেত্রটি খুবই কার্য্যকরী হবে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, শিক্ষার্থীদের মনে আবিষ্কারধর্মীতার উন্মেষ ঘটানো। প্রথম থেকে শিক্ষার্থীদের মনে অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ, কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের সামনে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ :

শিক্ষার্থীরা প্রধানতঃ দুটি উপায়ে জ্ঞান আহরণ করে—এক, নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে। দুই, অপরের কাছ থেকে শুনে বা পুস্তক পাঠ করে অপ্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বিধিবদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি অনুশীলন সাপেক্ষ। তাই পাঠক্রম প্রণেতারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানে পরিবর্তিত করার প্রক্রিয়াটিকে প্রথাগত শিক্ষার বিধিবদ্ধ নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য তাকে পাঠক্রমের অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টির জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক থাকতে পারে না এবং তার প্রয়োজনও নেই। কারণ এর উপাদান ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যে। যে পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের

মাধ্যমেই তারা অর্জন করবে নানা অভিজ্ঞতা, আয়ত্ব করবে নানা জ্ঞান। আর সেই জ্ঞানকে উপযুক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তাকে তার অর্জিত পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের মাধ্যমে আত্মস্থ করবে, নতুন জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠবে।

পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ :

পঠন-পাঠন নির্ভর কাজকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) মাতৃভাষা শিক্ষা, (২) গণিত (৩) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিচিত।

ভাষা শিক্ষা :

নব-পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমে ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি আক্রান্ত হয়েছে প্রধানত নব-পরিকল্পিত পাঠক্রম ও ভাষা-নীতিকে লক্ষ্য করে। বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা-নীতির বক্তব্য কি? বলা হয়েছে, সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো হবে না। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক-ভাবে একটি আধুনিক ভাষা (আপাততঃ ইংরাজী) দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়ানো হবে।

দেশ-বিদেশের শিক্ষার ভাষা-নীতি আলোচনা করলে এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির সুপারিশ মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা-নীতির মধ্যে খেয়ালখুশী বা উদ্দেশ্যমূলক কোন অভিসন্ধি নেই। বিশ্বের কোন স্বাধীন দেশে এই বিষয়টি কোন বিতর্কের বিষয়ই নয়। আমরা এখনো প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শিক্ষার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি নি বলেই এইসব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া এই বিতর্ক ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও নেই। একমাত্র নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় বেশির ভাগ প্রদেশে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ভাষা পড়তে হয় না। বলতে গেলে পশ্চিমবাংলা এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল। বামফ্রন্ট সরকার এসে সেই গ্লানি দূর করার জন্য বরং অকুণ্ঠ অভিনন্দন দাবি করতে পারে।

ভাষা ভাব আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম। চিন্তন, মনন, অভিনিবেশ,

অভিযোজন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার আধারও ভাষা। শিশু তার জন্মগত পরিবেশের মধ্যে যে ভাষা অনায়াসে আয়ত্ব করতে পারে সেই ভাষায় সে অন্যান্য জ্ঞান আহরণ করতে পারলে ব্যাপারটি যে অনেক সহজ ও গতিশীল হবে এ বিষয়ে কি কোন দ্বিমত থাকতে পারে?

আবার ব্যাপক গণশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প কিছু হতে পারে না। গ্রাম-গঞ্জের লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের ব্যবহারিক, সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনে ভাব প্রকাশের জন্য ইংরাজী ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কোন দিনই ঘটবে না, তাদের ঘাড়ে অপ্রয়োজনীয় বিজাতীয় একটি ভাষা শেখার বোঝা চাপিয়ে রেখে প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

যাক, সে-সব কথা। আশা করি তথাকথিত সমালোচকরা ব্যাপক গণশিক্ষা প্রসারের ভয়ে মিথ্যা আতঙ্কগ্রস্থ না হয়ে গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষা-নায়ক এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনগুলির সুপারিশপত্র একটু আলোচনা করে দেখবেন। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, সমালোচকদের অনেকেই নিজেদের রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও রবীন্দ্র অনুরাগী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু কবিগুরু তাঁর বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা থেকে এবং সারা জীবন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকে মাতৃভাষার স্বপক্ষে যে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করে গেছেন তা কি এঁদের অজ্ঞাত?

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চাই, "শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ"। এতদিন একই মায়ের সন্তান হওয়া সত্বেও যাদের মাতৃদুগ্ধ পানে বঞ্চিত রেখে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য মাতৃদুগ্ধ গ্রহণের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। এতদিন যারা সুবিধাভোগী হিসাবে শিক্ষাকে একমাত্র তাদের গোষ্ঠির অধিকার হিসাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন আজ তাঁদের "ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান"।

গণশিক্ষা প্রসারে পাঠক্রম ও ভাষার ভূমিকা

শ্রীগোলোকপতি রায়

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো তখন দেশে সাক্ষরের হার ছিল ১৪%। এতেই প্রমাণিত হয় যে শত বাগাড়ম্বর সত্বেও 'ইংরেজ রাজের' আমলে সরকারী প্রচেষ্টায় এবং মিশনারী ও স্বনামখ্যাত ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

এটাই স্বাভাবিক যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী ভারতবর্ষকে একটি প্রাগ্রসর আধুনিক দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে মোটেই উৎসাহী ছিল না। তেমনি উৎসাহী ছিল না লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করতে। এতৎ সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই ভারতীয় সমাজের বিকাশের স্বার্থে গণশিক্ষা প্রসারের দাবি উঠেছিল। "Servants of India" সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা গোপালকৃষ্ণ গোখেলের প্রচেষ্টায় সেই ভাবধারা আরো শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ভারতবর্ষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার স্বপক্ষে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সমসময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপরেখায় নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি অন্যতম প্রধান দাবি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তীকালে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-শিক্ষার ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। মিশনারীরাও নিজস্ব প্রচেষ্টায় বেশ কিছু কাজ করেছেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ছাড়া কেবলমাত্র স্বাধীনতা প্রাপ্তিই যে যাদুমন্ত্রের মতো সব কিছুতে কাম্য পরিবর্তন এনে দেবে না এই উপলব্ধি ছিল বলেই সার্বজনীন শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ভাবা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের যুগে শিক্ষাকে প্রধানত সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয় হিসাবে গ্রাহ্য করা হতো। এক শ্রেণীর 'বাবু' তৈরী করা এবং ব্রিটিশ সরকার ও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সেবা করার কাজে তালিম দেওয়ার সংকীর্ণ লক্ষ্য সামনে রেখেই তদানিন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হতো, কখনোই শিক্ষার্থীর জীবন ও সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য

রেখে নয়। তাই ১৮৩৫ সালের সরকারী সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভাব ও ভাষার দিক থেকে পুরোপুরি ইংরেজীতে পরিণত করে। নেহেরুর চোখে তাই তা এমনিভাবেই প্রকট হয়েছিল—

"ইংরেজরা ভারতবর্ষে একটি নতুন বর্ণ বা শ্রেণী তৈরি করেছে, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণী, যারা বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবলমাত্র নিজেদের জগত নিয়েই ব্যস্ত এবং যারা অসন্তোষ সত্বেও সারাক্ষণ শাসকশ্রেণীর মুখপানে চেয়ে থাকে।"

(ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া পৃঃ ৪১৩—১৪)

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা প্রভৃতি অভিশাপের মতো নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতার সমস্যা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। তাই বোধ হয় আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ১৯৫০ সাল থেকে ১০ বসরের মধ্যে ৬—১৪ বৎসরের সমস্ত শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতিকে সংবিধানের নির্দেশক নীতির অন্যতম সর্ত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। তা হলেই দেখা যাচ্ছে সার্বজনীন শিক্ষা প্রসার আমাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। অথচ সংবিধান চালু হওয়ার ৩১ বৎসর পরও সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের কাছে একটি অলীক বস্তু হিসাবেই রয়ে গেছে।

গণশিক্ষা বলতে কি বুঝায়ঃ

দ্রুত সমাজ বিবর্তন এবং দারিদ্র্য, বেকারী, সামাজিক পশ্চাৎপদতা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান প্রধানত শিল্পায়ন ও দ্রুত শিল্পবিকাশ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সাফল্য প্রধানত গণশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের দ্বারাই সম্ভব। কারণ স্বাভাবিক কারণেই সাক্ষরতার প্রসার ও অর্থনৈতিক বিকাশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া এর জন্য শিক্ষাকে নবতর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর তা প্রচলিত গতানুগতিক পাঠক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতির প্রান্তিক পরিবর্তন করলেই শুধু হবে না; তার জন্য চাই পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নবতর ধ্যান-ধারণা, কলাকৌশল ও প্রেক্ষাপটের উদ্ভাবন। বর্তমান সময়ে ভারতে গণশিক্ষা প্রসারের ভূমিকা ও গুরুত্ব মূলত এইখানেই।

যদিও সার্বজনীন শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রায় সমার্থক তবু তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বর্তমান। সার্বজনীন শিক্ষার ভিত্তি হলো সার্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা। ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, যেখানে ৬০%-এর বেশি পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবনয পন করে, যেখানে গ্রাম ও সহরের বেশির ভাগ গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে নিজেদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, সেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এতৎসত্বেও সমাজের সীমিত সামর্থের মধ্যে যা করা যেতে পারে তা হলো, গ্রাম ও সহরের শিশুদের যতদূর সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার মতো ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং একই সঙ্গে একটি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও কার্যাকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অক্ষর জ্ঞান ও বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জ্ঞানের সঙ্গেসঙ্গে শিশু ও বয়স্ক লোকেদের মধ্যে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা গড়ে তোলা, যাতে করে তারা সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করে এবং সার্থকভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সংক্ষেপে তার জন্য যা করা প্রয়োজন তা হলো, নিরক্ষরতা নির্মূল করা, শিল্প ও কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ। যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে চিরাচরিত কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কূপমণ্ডুকতা ও সর্বোপরি নিয়তি-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে পারে। স্বাধীনতার ৩৩ বৎসর পরও আমরা এইসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে তো পারিই নি, উপরন্তু তা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দারিদ্র্য, বেকারী, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোড়ামী আজ লক্ষ লক্ষ খেটে-খাওয়া মানুষের উপর অবর্ণনীয় দুর্ভোগই শুধু চাপিয়ে দিচ্ছে না, তা গোটা সমাজ কাঠামোটিকে বিরোধের আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও সেই সঙ্গে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য লাগাতার সংগ্রাম না করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এই বিভেদকামী প্রচেষ্টাকে ঠেকানো সম্ভব নয়। আর এইখানেই রয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনসহ দক্ষতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। আর

তা করতে হলেই দেখা দেয় গণশিক্ষায় পাঠক্রমের প্রশ্নটি, দেখা দেয় কি ভাষায় সেই শিক্ষা পরিচালিত হবে সেই প্রশ্ন।

পাঠক্রম ঃ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা অন্যতম গতিশীল শক্তি। স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমরা দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য লাগাতার সংগ্রাম করে আসছি। বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে জাতীয় নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংবিধানে যে নীতি ও প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল, আগে ও পরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ করেছে, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আজও তা কার্যকরী করা হয় নি। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নাকচ করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। বলতে গেলে কাঠামোগত ও বিষয়গত দিক থেকে প্রান্তিক কিছু রদবদল করে সেই ব্যবস্থাকেই বজায় রাখা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার ধারায় এমন একটি বনেদী-শিক্ষা ধারা গড়ে উঠেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বৃহত্তর অংশ সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সামান্যতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে একটি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা সামাজিক বিকাশের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবে। আর সেই শিক্ষার প্রধান বিষয়ই ছিল ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায়, দক্ষতা অর্জনসহ দার্শনিক কুটতর্ক এবং ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞান। আর সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীকে 'ব্রিটিশ রাজ' ও পুরাতনী সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত করে রাখা। কাঠামো ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা ছিল মূলত পুঁথিগত ও সাহিত্যধর্মী, সুতরাং সমাজের রক্ষণশীল শক্তির অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত, অথচ সমাজের সাধারণ মানুষের সম্মিলিত কর্ম-প্রচেষ্টায় সমাজ বিকাশের ধারায় সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিজ্ঞানের প্রতি নজর ছিল খুবই কম, কলাকৌশল, প্রযুক্তি-বিদ্যা ও পেশাগত দক্ষতার প্রতি নজর ছিল আরো কম। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরি শিক্ষায়ও ব্যতিক্রম ছিল খুবই প্রান্তিক। তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটতো সর্বতোভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সমাজের উচ্চবিত্তশ্রেণীর প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে।

দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ অনেকদিন থেকে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর

থেকে এই বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে আসছে। তার মূল কথা হলো, গ্রাম ও সহরের গরীব কৃষক, শ্রমিক ও খেটে-খাওয়া মানুষের ঘরের শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে, বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আর সেই সঙ্গে শিক্ষা-কাঠামো ও শিক্ষা-পদ্ধতির এমন পরিবর্তন দাবি করা হয়েছে যা নিরক্ষরতা সমূলে উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে আধুনিক যুগোপযোগী জীবনযাপন ও জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সার্থক ভূমিকা পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে।

বর্তমান সময়ে সার্বজনীন শিক্ষার মতো একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ সম্ভব না হলেও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ব্যাপক গণশিক্ষার একটি ভিত্তিভূমি গড়ে তোলা এখনই প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন সামনে এসে যায়—গণশিক্ষার পাঠক্রম কি হবে, আর তার ভূমিকাই বা কি হবে?

এখানে আমরা পাঠক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করে কেবল তার মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর তা করেছে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও কমিশন, বিশেষ করে কোটারী কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আবার রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মহান শিক্ষা-নায়কদের ধ্যান-ধারণাকেও তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করেছে।

এটাই স্বাভাবিক যে, আমাদের মতো শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ অথচ উন্নয়নকামী একটি দেশের গণশিক্ষার পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে—নিরক্ষরতা দূর করে ব্যাপক সাক্ষরতার প্রসার, গণিতের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান ও পারদর্শিতা, যাতে করে শিক্ষার্থী সমাজের আর্থ-সামাজিক বিকাশের অংশীদার হিসাবে তা সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারে, সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, সুস্থ ও সুন্দর আধুনিক জীবন-যাপন করার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ, সর্বোপরি মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দখল, যাতে করে শিক্ষার্থী কার্যকরীভাবে তার জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে, অর্জিত জ্ঞানকে সুসংগঠিত করতে ও প্রকাশ করতে পারে।

শিক্ষা হলো একটি গোটা মানুষ তৈরি করার প্রক্রিয়া। আর তা করতে হলে, শরীর, মন, অনুভূতি, জ্ঞান ও কর্মের উন্মেষ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সুতরাং পাঠক্রমকে অবশ্যই তার হাতিয়ার হতে হবে; জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মকে সুসংহত করার কাজ করতে হবে। তার মধ্যে ভাষা ও গণিতের জ্ঞান আয়ত্ত করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উপাদান এবং সার্থক ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সু-অভ্যাস গড়ে তোলার উপাদান যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ক্ষুধা, ভয়, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম ও জাতি-দম্ভ, কূপমণ্ডূকতা, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ প্রভৃতি পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবীয় মূল্যবোধ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়সহ একজন সক্রিয় ও সফল নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার উপাদান।

উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের কথা মনে রেখে গণশিক্ষার পাঠক্রমকে নিম্নোক্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক জগতের (মানব ও জীব-জগৎসহ) তথ্য আহরণ এবং প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহের কার্যকারণ সম্পর্ক জানা।

(২) প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান এবং সকল উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমভোগী শ্রমবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ সে বিষয়ে জানা।

(৩) দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি।

(৪) ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা।

(৫) মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশের উন্নতিসাধন।

(৬) গাণিতিক রাশি ও সরল গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা।

(৭) সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক দক্ষতা অর্জন।

উপরোক্ত বিষয়গুলির এমন সমন্বয় ঘটাতে হবে, যেন শিক্ষার্থীর মনে সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং তার মনে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার অনুসন্ধিৎসা জন্ম নেয়। যেন নিজের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের উন্মেষের মধ্য দিয়ে তার মনে সমস্ত মানুষের শ্রমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বিকাশ ঘটে। যেন নিজের সমাজ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানবতার

প্রতি প্রেমের উন্মেষ ঘটে। যেন ক্রম-বর্ধমান নান্দনিক অনুভূতিসহ গণতান্ত্রিক ও মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য পাঠক্রমকে মূলত চারটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।

১। খেলাধূলা ও শরীরচর্চা।
২। উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ।
৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ।
৪। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ।
(ক) মাতৃভাষা (খ) গণিত (গ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি।

গণশিক্ষায় ভাষার ভূমিকা :

ভাষা শিক্ষা পরিবেশ নির্ভর। জন্মের পর থেকেই শিশু যে ভাষার পরিমণ্ডলে বড় হতে থাকে সেই ভাষা সে স্বাভাবিকভাবেই সাবলীল গতিতে শিখে ফেলে। এর জন্য বাড়তি কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দেশের মানুষের কাছেই সেই ভাষা হলো তার মাতৃভাষা। সে তার মাতৃভাষায় প্রকাশিত ভাব বুঝতে পারে এবং নিজেও সেই মাতৃভাষায় মনের ভাব মুখে মুখে প্রকাশ করতে পারে। সেই সঙ্গে তার চিন্তা-চেতনার বিকাশও ঘটে মাতৃ-ভাষাকেই আশ্রয় করে। সুতরাং সেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি তাকে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি জ্ঞান বিষয়ক জিনিস পরিবেশন করা হয় তবে সে অতি সহজেই তা আয়ত্ত্ব করতে পারবে। আবার জ্ঞান নির্ভর বিষয়গুলি পাঠের মধ্য দিয়ে সে যেমন প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তেমনি এর ফলে তার ভাষা-জ্ঞানও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে চিন্তন, মনন, বিভিন্ন জ্ঞানের সংযোজন ও অভিযোজনের মাধ্যমে তার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও রচনা-শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং গণশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র মাতৃভাষা পড়ানো খুবই জরুরী। এই স্তরে বিজাতীয় পরিবেশের কোন একটি ভাষা শেখার গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সমস্ত কিছুই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী অবশ্য পাঠ্য হিসাবে ছয় বৎসর ধরে পড়াতে হবে ·····"। রিপোর্ট অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন ১৯৫২-৫৩ পৃঃ ৬৮।

"এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, এই নির্দেশক নীতিতে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা একমাত্র ভারতীয় ভাষায় হবে বলেই ধরে নিতে হবে, ইংরাজী ভাষায় নয়।"

"ইংরাজী ভাষা পড়ানো সম্বন্ধে বলা যায় যে, আইনত দেখতে হবে তা যেন প্রাথমিক স্তরের ভাষা শিক্ষার অঙ্গ না হয়।"

গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া রিপোর্ট অফিসিয়াল,
ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন ১৯৫৭।

"সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুসারে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা যারা গ্রহণ করছে সেইসব শিশুকে কোন প্রকার ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া অপচয়ের সামিল হবে। ইংরাজীর মতো সম্পূর্ণ বিজাতীয় একটি ভাষা অল্পদিন শেখালে তাতে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না। বরং এর ফলে অন্যান্য বিষয় ও আঞ্চলিক ভাষা শেখার জন্য যে সময় পাওয়া যায় তা কমে যাবে।"

গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া রিপোর্ট অফিসিয়াল,
ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন, ১৯৫৭।

বাস্তব অবস্থার আলোকে উপরোক্ত সুপারিশগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেশে পড়াশুনা করার বয়স রয়েছে এমন ছেলেমেয়েদের একটি বিরাট অংশ বিদ্যালয়ে আসে না। যারা আসে তাদেরও অনেকেই দু'এক বছর পর পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দেখা যায় যে, ১ম শ্রেণীতে যত ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় তার মাত্র ৩০।৩৫ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে। এই যে বিরাট অপচয় বছরের পর বছর ঘটছে তার অন্যতম কারণ প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী ভাষা পড়ার বাধ্যবাধকতা। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বয়স ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের স্তর এমন থাকে যে, সেই সময়ে যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে একটি বিজাতীয় ভাষা শেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ গ্রাম সহরের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে ইংরাজী শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে রেখে শিক্ষা দেওয়ার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বাস করেন গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ পরিবেশে। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যর্থ প্রয়াসে অনেক সময় নষ্ট করে অথচ ইংরাজী শিখতে পারে না, উপরন্তু এই

চাপের জন্য অন্যান্য জ্ঞান বিষয়ক বিষয় শেখা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া আমাদের দেশের মতো কৃষি প্রধান দেশের অগণিত গ্রামীণ মানুষের বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের দিক থেকে ইংরাজীর কোন স্থান নেই। তারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজস্ব পরিবেশের মধ্যেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজ করে। মোটামুটিভাবে তাদের সেই কর্মক্ষেত্রে ইংরাজী ব্যবহার করার সুযোগ বা প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। মাতৃভাষায় ভাল জ্ঞান থাকলেই তারা তাদের সমস্ত কাজ চালিয়ে নিতে পারে। আবার আধুনিক কালে ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত বিকাশের যুগে গণিত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান জীবন-যাত্রার অপরিহার্য্য অংশ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় একটি অপ্রয়োজনীয় বিজাতীয় ভাষা শেখার জন্য সময় ও উদ্যম নষ্ট না করে তা গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি শেখার কাজে ব্যয় করলে অনেক বেশি উপকার হবে। এমনি একটি সঠিক ভাষা-নীতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শিক্ষাকে গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের কাছে আরো অর্থবহ করে তুলবে। ফলে একদিকে যেমন অসময়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ কমে যাবে, তেমনি অন্যদিকে যারা এখনো বিদ্যালয়ে যায় না তারা পড়াশুনা করতে উৎসাহী হবে। বিশেষ করে গণশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে, তা প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমেই হোক আর প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমেই হোক, মাতৃভাষাকে একমাত্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। একবার মাতৃভাষায় দক্ষতা জন্মালে তা শিক্ষার্থীর কাছে জীবনব্যাপি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। সবচেয়ে বেশি উপকার হবে এই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শাসক ও শোষক শ্রেণী যে বঞ্চনা ও শোষণ চাপাতে চায় তাকে তারা রুখতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে "মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশন অব কমিশন অব ইমোশান্যাল ইন্টিগ্রেশন ১৯৬২"-এর একটি সুপারিশের উল্লেখ করা যায়।

(ক) আমরা সুপারিশ করছি যে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত একমাত্র আবশ্যিক ভাষা হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। আমরা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, এই স্তরে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের ভাষা কথনে পারদর্শী হতে সাহায্য করা এবং কিভাবে তারা অনর্গলভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে তা শেখানো।

(খ) যাতে তারা শুদ্ধভাবে ও অর্থগ্রাহ্য পদ্ধতিতে পড়তে এবং কোন প্রকার ভুল না করে লিখতে পারে।

(গ) এই বয়সের উপযুক্ত সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় গড়ে তোলা।”

১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অনুমোদন প্রাপ্ত ইংলিশ স্টাডি গ্রুপের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

“এটা কি যুক্তি সম্মত যে, নিজের মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দখল জন্মানোর আগেই শিশুকে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী) ইংরাজী শেখাতে হবে? দ্বিতীয় ভাষা শেখার প্রাথমিক সর্ত হিসাবে মাতৃভাষায় ভাল দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন, তবেই দ্বিতীয় ভাষায় প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া সম্ভব।”

পরিশেষে কোঠারী কমিশনের—কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এবং যার সুপারিশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অধিকাংশই গ্রহণ করেছে—একটি মন্তব্য তুলে ধরছি।

“নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী) শিশু পড়া, লেখা ও স্বাধীন রচনা প্রভৃতি শিক্ষার মৌলিক হাতিয়ার সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করবে এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাই এই স্তরে মাতৃভাষায় দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য প্রথম চার বৎসর মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়তে দেওয়া হবে না।”

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব এবং প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা অবশ্যই রাখা উচিত নয়। প্রাগ্রসর স্বাধীন দেশগুলি সম্পর্কে আমাদের সংবাদও এই নীতির সত্যতা প্রতিপন্ন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাঙ্গেরী, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী, রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, স্পেন, জাপান প্রভৃতি প্রতিটি দেশেই প্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র একটি ভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা পড়ানো হয়।

ভারতবর্ষেও একমাত্র নাগাল্যাণ্ড ও মনিপুর বাদ দিয়ে প্রতিটি প্রদেশেই প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র মাতৃভাষা পড়ানো হয়। বিহার, হারিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর-প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো হয় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে। জম্মু ও কাশ্মীরে তা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। গুজরাট, অন্ধ্র-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরলায় পঞ্চম শ্রেণী থেকে ও অন্যান্য রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো হয়।

এ অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও ভাষানীতি সম্পর্কে

যে বিরোধিতা চলছে—যার অংশীদার কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং কয়েকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী—তা আদৌ শিক্ষা বিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

তাদের যুক্তিগুলি উদ্ভট ও অন্যায্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যারা পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী রাখার স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, তাদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংগঠন ও স্বীকৃতি থাকা সত্বেও তারা অন্যান্য রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী বর্জনের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। তারা, এমন কি, এই মন্তব্যও করছেন যে, পশ্চিমবাংলার নব-পরিকল্পিত পাঠক্রম ও ভাষানীতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

কিন্তু আমরা বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি যে, এই পাঠক্রম ও ভাষানীতি মূলত স্বাধীনতা পূর্বযুগের আশা-আকাংক্ষা এবং পরবর্তীকালে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার বার বার বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও কমিশন যে সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ করেছে এবং যা কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্যসরকার নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে, তারই ভিত্তিতে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার একটি কার্যাকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মাত্র।

ম্যালথাসের অনুবর্তীরা পথে নেমেছেন

শ্রীপার্থ দে

কোন কোন ব্যক্তি কেন যে বেশ দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটা আচার-আচরণ করছেন, আর ঠিক কোন বিষয়টার তাঁরা প্রতিবাদ করছেন তা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না, শিক্ষার কোন বিষয়টার তাঁরা বিরোধী আর কোনটার তাঁরা পক্ষে সেই ব্যাপারটাই তাঁরা তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন অনেক কথা বলতে গিয়ে। সেই তালগোল পাকানো ব্যাপারটা থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতেও পারছেন না। সম্ভবতঃ সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত বলতে হচ্ছে বাম-পন্থীরা তাঁদের বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলছেন এবং তাঁদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে না বলে তাঁরা অভিমানও প্রকাশ করছেন। মোটমাট ঘটনাটা প্রায় হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বামপন্থী সরকারের একজন মন্ত্রী ১৯৮০ সালের অকটোবর মাসে এঁদের কয়েকজনের কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন। তিনি এঁদের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে তারা বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী সঠিকভাবে জ্ঞাত হয়েছেন কিনা। তাঁদের কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই সরকারের তরফ থেকে তা সরবরাহ করার চেষ্টা করা হবে। এই সামান্য পত্রটির বেশ কয়েকটি প্রত্যুত্তর দৈনিক সংবাদপত্রে খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। অনেকেই দেখেছেন। সে-সব পত্রে মূলতঃ যা বলা হোল তা নিম্নরূপ—বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী মানার কোন প্রয়োজন তাঁদের নেই। যতটুকু তারা জানেন তাই যথেষ্ট। বামপন্থীরা বিশেষতঃ কমিউনিষ্টরা অতি কুৎসিৎ ও ধান্দাবাজ জীব। বামপন্থী সরকারের নিকট তাঁদের কোন প্রশ্ন নেই, কেবল প্রশ্ন হোল, যাঁরা প্রাথমিক পাঠ্যসূচী কমিটিতে ছিলেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? পরিচয় কি? স্বভাব কি? অভ্যাস কি? এবং শেষ কথা হোল, কোন সুপারিশ বা মন্তব্য করা হবে না।

পরিস্থিতিটার মধ্যে পরিহাস এই যে এইসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রথম প্রকাশ্য পত্রাঘাতগুলিই দেখিয়ে দিল কি অপরিসীম অন্তঃসারশূন্য এই বিশেষ বিষয়ে তাদের মানসিকতাটি ছিল, এবং এরপর থেকে যতই তারা বোধ করছেন যে তাঁদের যুক্তিগুলো লাগসই হচ্ছে না, নতুন লাগসই যুক্তি আবিষ্কার করতে হবে,

ততই তাঁদের নতুন যুক্তিগুলো আগের যুক্তিগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছে, আর ততই তালগোলের কাণ্ডটা বাড়ছে।

প্রশ্নগুলো আমরা কিছুটা পরীক্ষা করতে পারি। এক, পাঠক্রমের কমিটি গোপনে গঠিত হয়নি। তাঁরা গোপনে কাজও করেন নি, অথচ ওঁরা বললেন এইসব রচয়িতাদের পরিচয় তাঁরা জানতেন না অতএব সমস্ত সূত্রায়নটির বিরোধিতা করা উচিত। হয়তো তখনো পর্যন্ত তাঁরা এদের নাম জানতেন না। কিন্তু তারপর তো সমিতির সদস্যদের নামধাম পরিচয়সহ বহু সহস্র প্রতিলিপি ছেপে বিতরণ করা হোল। তাঁরাও জানলেন। তারপর কি তাঁরা পাঠক্রম সমিতির বক্তব্য সমর্থন করলেন? না। কেন? ধরে নেওয়া যায় বিষয়বস্তুতে তাঁদের আপত্তি আছে। সে কথাতো গোড়ায় বললেই হোত। রচয়িতাদের পরিচয়ের প্রশ্নটা ছিল অবান্তর।

দুই, বামপন্থীরা রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করতে চান কেন না নতুন একটি ভাষাপাঠ তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু যখন দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের "সহজ পাঠ" প্রকাশের পর থেকে চল্লিশ বছর এই বইটিকে পাঠ্য করার কথা কেউ ভাবতেই চাননি এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ভাষাপাঠগুলি 'অচলিত' করেই রাখা হয়েছিল, তখন তাঁরা রবীন্দ্র-প্রবক্তা হিসেবে যতখানি কৃতিত্ব দাবী করতে চাইছিলেন তা আর পারলেন না। আর আরো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল যখন এইসব 'রবীন্দ্র-দাবীদাররা' রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা-সংক্রান্ত সমগ্র জীবনের বক্তব্যটাই নাকচ করতে চাইলেন। তাঁরা এতদূর যেতে চাইলেন যে প্রমাণ করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী ভাষা শেখানোর পক্ষে ছিলেন।

তিন, তাঁরা দাবী করলেন শিশুরা কিছুই শেখে না ছন্দ, শব্দ, ছবি আর আনন্দ ছাড়া। কাজেই শিশুদের কোন ধারণা দেওয়া যায় না। আর প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বললেন শিশুদের 'শ্রেণী-সংগ্রাম' শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং সেটা আশংকার ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হোল, শিশুদের মন যদি কোন ধারণা গ্রহণ করতেই না পারে তাহলে তাদের আসরে ভূতের গল্পও যা শ্রেণী-সংগ্রামও তাই। সমান নির্দোষ। এতে ভয় পাওয়ার কি আছে?

চার, শিক্ষাক্রমে 'শোষণহীন সমাজ' ইত্যাদি কথাগুলো আমদানী করা অনুচিত। কিন্তু তাঁরা কি শোষণমূলক সমাজের পক্ষে? তাও তো মনে হয় না যখন তারা বলেন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিক্ষা না দিলে সমাজে দুটি শ্রেণী সৃষ্টি হবে, (খুবই আশ্চর্যের কথা, এতদিন পর এই প্রথম সমাজে শ্রেণী

সৃষ্টি হবে। এতদিন শ্রেণীর সৃষ্টিই হয়নি। তাহলে এখনই শ্রেণী-সংগ্রামে অত আতংক ?)

পাঁচ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীকার হরণ করা হচ্ছে। ওঁরা তার বিরোধী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার গণতন্ত্রীকরণের তাঁরা সমর্থক নন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় যাঁরা কায়েম আছেন তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণের তারা বিরোধী। অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের পরিচয় কি, স্বভাব কি, অভ্যাস কি, স্বৈর-শাসকদের প্রতি তাঁদের আনুগত্য কি, এসব প্রশ্ন তাঁদের নেই।

ছয়, এঁরা বলছেন ভারতের দেশপ্রেমিকরাই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন, আর সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার স্বপক্ষে। এমন যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, এই ব্যাখ্যাটি দেশের সামনে হাজির করা এবং শিক্ষা-আন্দোলন সম্পর্কে এতদিন যে ধারণা ছিল সেটি মানুষের মন থেকে দূর করার চেষ্টা তাঁদের আগে করা উচিত। বামপন্থীরা এই নতুন আবিষ্কারটি জানেন না বলে তাঁদের অভিশাপ দেওয়া আগে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হোল ভারতের দেশ-প্রেমিকরা তো সার্বজনীন শিক্ষার জন্যও আন্দোলন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর ৩৪ বছর পার হয়ে গেল এঁরা তো কেউ জনগণের সার্বজনীন শিক্ষার জন্য কোন দাবী করলেন না! এবং এখন তা করা হচ্ছে দেখেও খুশী হচ্ছেন না! আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে! সোভিয়েত দেশ, কি চীন, কি ভিয়েতনাম অথবা জাপান বা জার্মানীতেও কি সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু হয়েছিল? আর এর ফলে জনগণের যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল তা কি সাম্রাজ্যবাদীদের অবদান ও দেশপ্রেমিকদের ব্যর্থতা?

সাত, এঁরা বলেন যে মাতৃভাষা মাধ্যম বিষয়টা তারা স্বীকার করেন। কেন স্বীকার করেন? এইটুকু স্বীকার করেই তাঁরা ভুল করেছেন। এই কথাটি স্বীকার করার অর্থ হোল, সামাজিক মনন, চিন্তন, মত বিনিময় ও কর্মকাণ্ডে মাতৃভাষার ভূমিকা অসীম এবং তার কোন বিকল্প হতে পারে না। এর অর্থ হোল, যে-কোন চিন্তা, ভাব, যুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রকাশ করা যায় এবং সেটিই সব থেকে কার্যকরী হতে পারে। আবশ্যই তার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। অথচ একই নিঃশ্বাসে বলছেন, ইংরাজী ছাড়া উচ্চ চিন্তা করা যায় না, এমনকি ইংরাজী না শিখলে মাতৃভাষা শেখাই যায় না। মাতৃভাষায় যদি উচ্চ চিন্তা করা না যায় তবে মাতৃভাষাটি মাধ্যম হবে

কেন? নিম্ন চিন্তা করার জন্য? আমাদের সমাজে তো উচ্চ চিন্তারই প্রয়োজন। ইংরাজীতে যখন 'উচ্চ চিন্তা' করা যায় তখন নিশ্চয়ই 'নিম্ন চিন্তাও' করা যায়। শুধু ঐ ভাষায় কাজ চালালেই তো হয়। আর ইংরাজী না শেখালে যদি মাতৃভাষা না শেখা যায় তবে তো মাতৃভাষা শেখা আরো কঠিন ব্যাপার। অত কষ্ট করে একটা ভাষার মাধ্যমে এটা না শিখে শুধু ইংরাজী শিখলেই তো পরিশ্রম কমে।

এইসব স্ববিরোধী যুক্তির তালিকা বাড়িয়ে তোলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হোল, এই ধরণের অদ্ভুত যুক্তিগুলি তোলা হচ্ছে কেন? এগুলি তোলা হচ্ছে এজন্যই যে 'গণশিক্ষা' বিষয়টির বিরোধিতা করতে হবে, এবং সে কাজটা করার রাজনীতিগত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই, অতএব তার কোন সক্ষম যুক্তিও নেই। তাদের যুক্তিতর্কগুলি অসার হওয়া সত্বেও কেন তাঁরা গণশিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করছেন সে কথার ব্যাখ্যা ওঁরা আমাদের কাছে হাজির করবেন না। সেটা খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

কোন কোন সংবুদ্ধির ভাল মানুষেরা যে প্রশ্নটা সরলভাবে করছেন সেট বিশ্লেষণ করলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি মনে হয়। সরল প্রশ্নটা হোল, এই যে বামপন্থীরাও চান শ্রমিক-কৃষকসহ সমস্ত জনগণ শিক্ষিত হোক, ভালভাবে পড়াশুনা হোক, এদেশের ছেলেমেয়েরাও কাজ বা চাকুরী বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতার যোগ্য হয়ে উঠুক। আর বিরোধীরাও, মনে হচ্ছে, তাই চাইছেন। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিৎ এটা দু'পক্ষই চান। ইংরাজী ভাষা যে শেখানো উচিত তা দু'পক্ষই মনে করেন। এখন লড়াইটা হোল ইংরাজী ভাষাটা প্রাথমিক স্তরে আরম্ভ করা হবে, না মাধ্যমিক স্তরে আরম্ভ করা হবে? এই নিয়ে এত জেদই বা কেন? আর এত আইন ভাঙা বা অবস্থানই বা কেন? এটাতো আলোচনা করে মিটিয়ে ফেললেই হয়।

সত্যিই কি এই সামান্য বিরোধটি আলাপ-আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া যায়? হ্যাঁ, তা যেত যদি উভয় পক্ষের এই আগ্রহটিই প্রধান হোত যে শ্রমিক, কৃষক, ও মধ্যবিত্তকে যা কিছু শেখানো হবে তা হবে জীবনমুখী, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক। এবং যে-ব্যবস্থা করলে ভালো শেখানো যাবে তাই করা উচিত। যে সময় মাতৃভাষা আরম্ভ করলে ভালো শেখানো যায় সে সময় মাতৃভাষা, যে সময়ে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো আরম্ভ করলে ভালো শেখানো যাবে সে সময়

দ্বিতীয় ভাষা আরম্ভ করা যাবে, কেউ আপত্তি করবে না। আর তখন আমরা সারা বিশ্বের ও আমাদের দেশের ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলি বিচার করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। কিন্তু তা হচ্ছে না কেন ?

ইংরাজী পরে আরম্ভ করলে ভাল শিখবে, এটা সত্য হ'লে কি তাঁরা আশ্বস্ত হবেন ? মোটেও না। ইংরাজী বা বাংলা ভালো শিখলো কি না শিখলো এটা ওঁদের মাথা ব্যথা নয়। ওঁদের আসল কথা হোল ইংরাজীর একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার স্থান থাকবে কিনা।

যে ভাষা পরিবেশে জীবন্ত নয়, সে ভাষা কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধ সুযোগে শিক্ষা দিতে হয়, সেই ভাষাটি সচেতনভাবে, অপেক্ষাকৃত বেশী বয়েসে শেখার কি কি সুবিধা, আর অল্প বয়েসে অপরিণত শিশুদের একটা পরিবেশের ভাষার সাথে সাথে একটা দূরবর্তী ভাষা শেখানোর কি কি অসুবিধা সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা মিলিয়ে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে গেছেন। সারা বিশ্বের ভাষা-শিক্ষাবিদরা আরো বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই বিষয়টিকে একটা শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছেন। তবুও এইসব বিরোধীদের এইসব অ-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কেন ? একবার তো ভেবেও দেখতে পারতেন এতে কিছু ভাল হতে পারে কিনা। কিন্তু বিরোধীদের কাছে প্রশ্নটি বিজ্ঞানের নয়, প্রাধান্যের। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে সংঘর্ষ হয় না। সংঘর্ষ হয় সেই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রাধান্যের যে পুনর্বিন্যাস হয় তাকে ঘিরে। তারা বলছেন এই ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক ও কৃষকরা ইংরাজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। এবং এভাবে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হোল তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবেন। ইংরাজী না জানলে চাকুরী পাওয়া যায় না। সর্ব-ভারতীয় চাকুরীতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, অবস্থাপন্ন বাড়ীর ছেলেরা বা মেয়েরা অর্থব্যয় করে শিখে চাকুরী পাবে, দুটো শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং বামপন্থীরা এজন্য দায়ী থাকবেন। সত্যিই কি এটা প্রগতিশীল বক্তব্য ? এ রকম অভিনব চিন্তা খুবই দুর্লভ। ভারতের সমস্ত শ্রমিকের জীবনের ভবিষ্যত মুক্তি হবে চাকুরী লাভের মধ্যে, শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র ইংরাজী জানা চাকুরী লাভের মধ্যে, কৃষি-জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কাজ করার সুযোগের মাধ্যমে নয়। শ্রমিকদেরও যন্ত্র চালনার পরিবর্তে মুক্তি

হবে ইংরাজী জানা চাই এমন চাকুরীর মধ্যে। এই হোল ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্যই এমন যদি হোত যে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি শিখলে সবাই চাকুরী পেয়ে যাবে তাহলে বামপন্থীদের কখনোই উচিৎ নয় চাকুরীতে যোগ দিতে এতগুলি মানুষকে বাধা দেওয়া। ভারতবর্ষের সমাজে এতগুলি মানুষের জন্য এতগুলি চাকুরী কি কেউ সৃষ্টি করে রেখেছেন? শ্রমিক-কৃষকের কথা না হয় বাদই দিলাম। মধ্যবিত্তের সব মেয়েদেরও বাদ দিলাম। মধ্যবিত্ত ছেলেদের সকলের চাকুরী জুটবে? বিখ্যাত ব্যক্তিরা এর উত্তর দেবেন কিনা জানি না। তাঁরা বলতে পারেন ওসব আমাদের এক্তিয়ার নয়। যুবশক্তিকে এদেশে সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করা হবে, না ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হবে, সে ব্যাপারে হয়ত তারা নিরপেক্ষ থাকতে চাইবেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য যে-কটি আঙুলে গোনা চাকুরী আছে সেগুলিতে সবাই যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে সবাইকে ইংরাজি শেখাতে হবে। খুবই গণতান্ত্রিক কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু কথাটির মধ্যে জনগণের প্রতি কোন দরদ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর, অল্প কয়েকজন নির্বাচিত হও এবং সংখ্যাগুরু অংশ বাতিল হও, এরূপ একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিতই রয়েছে। আর এই কথাটা মেনে নিলেই মেনে নিতে হবে ইংরাজী ভাষাই হবে সব পরীক্ষার নিরিখ। মূলকথা হোল, ইংরাজির গুরুত্ব হ্রাস করা চলবে না। সব যোগ্যতা মাপা হবে ইংরাজি দিয়ে। শ্রমিকরা, কৃষকরা ও মধ্যবিত্তরা এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে নিন যে, আমরা পারি না পারি ইংরাজি জানাই আসল যোগ্যতা।

শিক্ষার্থী ইংরাজীর জন্য প্রথম থেকে নিজেদের প্রস্তুত করুন এবং দুর্বলভাবে শিখুন ও হীনমন্যতায় ভুগতে থাকুন। প্রতিদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়ে নিজেদের দুর্বল ইংরাজিকে দায়ী করুন এবং সমস্যার প্রকৃত কারণ যে সমাজের সম্পর্ক ও অর্থনীতি তাকে চিনতে ব্যর্থ হোন। আর চালাক লোকরা শহরে চটকদার কৃত্রিম ইংরিজিয়ানা দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ্যতম বলে বিবেচিত হোন। এখানে প্রশ্নটা হোল একটা কৃত্রিম মান, শ্রমিক-কৃষকের নামে শপথ নিয়ে, বাধ্যতামূলকভাবে ও স্থায়ীভাবে চালু রাখা। এটা স্বাভাবিক নয় বলেই শ্রমিক-কৃষকেরা এর সুযোগ কোন দিনই নিতে পারবে না।

অতএব, মধ্যবিত্তরা একটা সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। এটা একটা স্বপ্ন। ওঁরা তাদের বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে প্রতিযোগিতাই জীবনের

মূল সত্য, আর তাই প্রতিযোগিতায় সফল হবার জন্য, অন্যদের পিছনে ফেলার জন্য চাই একটা হাতিয়ার—একটা কৃত্রিম হাতিয়ার হলে সেটা নিজেদের সুবিধে মতো ব্যবহার করা যায়। একটা কৃত্রিম ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে মোহগ্রস্ত করতে সেজন্য এত আগ্রহ।

কৃত্রিম কথাটা এই প্রসঙ্গে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে যাঁরা একটু তলিয়ে দেখবেন তাঁরাই বুঝবেন। 'বুদ্ধির মানাংক' 'ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা' ব্যাপারগুলি আসলে কি? একটা প্রশ্ন-তালিকার ভিত্তিতে হিসেব করা হয় একটা মানুষের মনের বয়স কত। প্রশ্নগুলির সাথে মনের বয়সের সম্পর্ক আছে কিনা, ব্যক্তিটি কোন পরিবেশে, কোন পরিবারে বেড়ে উঠছে, সে প্রশ্নমালাগুলির সাথে পরিচিত কি না, এসব হিসেব নেওয়া হয় না। যাঁরা এই প্রশ্নগুলির তালিকা করেন তাঁদের নিজেদের পরিবার ও পরিবেশের হিসেব নিয়েই তাঁরা প্রশ্ন করেন। তাই এই পরীক্ষার সময় কৃষক বা মজুরদের ছেলে-মেয়েরা বুদ্ধিহীন প্রতিপন্ন হয়ে নাকচ হয়ে যায়। এরূপ মনগড়া মাপকাঠিকেই বলা যেতে পারে কৃত্রিম।

ইংরাজি ভাষার কিছুটা প্রয়োজন আছে যা অকৃত্রিম। যেমন এই ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ, ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ইংরাজি জানা একটা অংশের উপস্থিতি। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তার বেশির ভাগটাই কৃত্রিম একথা স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায়? আমাদের সমাজে ইংরাজির প্রয়োজন বস্তুতপক্ষে কতখানি, তার প্রকৃত গুরুত্ব কতখানি তা বিচার করতেও এদের ভয়। এটা যে দ্বিতীয় ভাষা, এর প্রয়োগ যে সীমাবদ্ধ, ভাষাটা যে সরকারী কাজে ব্যবহার হয় তাই আমরা শিখি, বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় তাই আমরা শিখি, এই দু'টি সর্ত না থাকলে শেখবার আগে দুবার ভেবে দেখতাম, এটা ওঁরা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু এগুলি বাস্তব সত্য। মাতৃভাষার অকৃত্রিম ও অসীম প্রয়োজন, ইংরাজির কৃত্রিম ও সীমাবদ্ধ প্রয়োজন, একথাটা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন। ইংরাজি ভাষার সত্যকার প্রয়োজনটুকু যদি এঁরা বস্তুগতভাবে দেখতেন তাহলে বিতর্কটাই থাকতো না। সেভাবে তাঁরা দেখবেন না বরং কেউ যদি ইংরিজিয়ানার গুরুত্বটিকে যথাযোগ্য স্থানে নিয়ে আসতে চান তার ওঁরা বিরোধিতা করবেনই। এত বাক্যজালের এটিই কারণ। কিন্তু আজ যাঁরা আপন শ্রেণী-স্তরের প্রাধান্য রক্ষা করার জন্য এত মারমুখী তারা হিসেব রেখেছেন কি যে অর্থনীতি ও সমাজের সংকট এত

গভীর যে উচ্চ ও মাঝারিসহ মধ্যবিত্তের সমস্ত স্তরগুলিকে তা চূড়ান্তভাবে গ্রাস করতে চলেছে? প্রাধান্য রক্ষার এই নাটুকেপনাসহ তাঁরা তলিয়ে যেতে চলেছেন? সীমাবদ্ধ চাকুরীর জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাতে তো শ্রমিক-কৃষক এখনো যোগ দেয় নি। শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যেই এত প্রতিযোগিতা যে কে টিকবে কে না টিকবে ভেবে সবাই আতংকিত। আমাদের এই বিরোধীরা বলছেন, দেখছেন না কেমন সব ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো বেড়ে উঠেছে; লোকে ইংরাজী শিখতে চাইছে। আর তার জন্য অর্থব্যয় করছে, ঝরঝরে চটপটেভাবে শিখছে। অতটা না পারেন একটু সান্ত্বনা দেবার মতো কিছুটা অন্ততঃ শেখান গরীবদের ছেলেমেয়েদের। এটা হোল মধ্যবিত্তদের জীবনের সংকটের লক্ষণগুলি সম্পর্কে একটা হৃদয়হীন তামাশা। শ্রমিক-কৃষকের প্রতি দরদের এতে চিহ্নমাত্র নেই।

দেশে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয় বাড়ছে বলে আমাদের সকলকে ইংরাজিকেই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় করতে হবে, তাতে ভাল হোক আর মন্দ হোক? সেটাকে গণতান্ত্রিক প্রবণতা হিসেবে দেখতে হবে? দেশে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অপসংস্কৃতি মাথা চাড়া দিচ্ছে, কুৎসিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন বাড়ছে, তরুণদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার বাড়ছে, মানুষ দিশেহারা হয়ে মাদুলী কিম্বা গুরুর সন্ধান করছেন, বেপরোয়া হয়ে চিট ফাণ্ডে টাকা জমা দিচ্ছেন, এগুলি কি গণতান্ত্রিক প্রবণতা, না তীব্র সংকট থেকে উপজাত বিকৃত আচরণ?

দেশের ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকট, পরিকল্পনার ব্যর্থতা, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ভয়াবহ সংশয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যত। টিকে থাকতে হলে বন্ধুকে, প্রতিবেশীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। চলেছে নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই মধ্যবিত্ত সমাজ দিশেহারা হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন একটা উপকরণ যা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে বিশিষ্টতা দেবে। যে বিদ্যালয়ের আপাততঃ উজ্জ্বলতা আছে, যে বিদ্যালয়ে প্রবেশমূল্য বেশী, সেই হয়তো তার সন্তানকে বিশিষ্টতা দেবে। তাই সেখানে ভীড় হচ্ছে। মধ্যবিত্ত জীবনের এই অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছে এদেশের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী অর্থনীতি। যেমন ক্রেতাকে বিশ্বাস করানো হয় অধিক মূল্য দিয়ে পোশাকটি কিনলে কুৎসিৎ মানুষকেও রূপবান দেখায়, তেমনি অসহায় অভিভাবককে বিশ্বাস করানো হচ্ছে অধিক অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয় তার শিশুকে অপরাপর শিশুদের পিছে ফেলে চাকুরী ধরতে এগিয়ে দেবে। কিন্তু

সত্যিই কি এ সব পণ্যের কোন বাড়তি গুণ আছে? ইংরাজি মাধ্যমে পাশ করলেই এদেশে চাকুরী হয়, আর অন্যেরা কেবল বাতিল হয়?

শ্রমিক-কৃষককে যাঁরা এর অনুকরণ করতে বলেন তাঁরা আসলে হলেন শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যালথাসের অনুবর্তী। অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস যেমন বলেছিলেন খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ধীরে, জনসংখ্যা বাড়ে দ্রুত। তাই যত মানুষ ততজনের খাদ্য থাকে না। মানুষে মানুষে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। যারা অযোগ্য তারা হেরে যায়। ইংরাজি শিক্ষার নাম করে যাঁরা হৈ চৈ করছেন তাঁরা এদেশের লোককে বিশ্বাস করাতে চাইছেন জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটাই আসল। তাঁরা বোঝাতে চাইছেন তাঁদের পছন্দমতো বাছাই এর মানটিই ধ্রুব এবং তাঁরা বোঝাতে চাইছেন তাঁরাই জনদরদী এবং এসবের বিপরীত গণ-শিক্ষাকে যাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন সেই বামপন্থীরা শিক্ষায় সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছেন। কিন্তু সেটা বামপন্থীদের অভিসন্ধিপ্রসূত নয় এইটাই আজকের বিশ্বের গৃহীত গণতান্ত্রিক প্রবণতা।

আগামী দিনে এ সমাজে প্রধান ঘটনা কি এই হবে যে, ক্রমশ সংকুচিত চাকুরীর ক্ষেত্রটির জন্য কোটি কোটি যুবক-যুবতী হানাহানি করবে? বেশির ভাগ ব্যর্থ হবে? তাতে সমাজ টিকবে? নাকি যারা চাকুরী করবে তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক যুবক-যুবতী তাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্য চাকুরীর থেকে বেশী কাজ করবে আর সমাজটাকে বাঁচাবে। এ সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি অনুধাবন করতে পারলে ভাল হয়।

শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে :

"একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও নিয়োগের সঙ্গে একটা খুব সরল ও স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। আমরা সবাই জানি যে, যে-কোন সরকারী চাকুরী এমন কি একটা পোষ্ট অফিসের করণিকের চাকুরীও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেক পেশা এবং নিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আইন থেকে সর্টহ্যাণ্ড এবং নার্সিং থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং অনুপ্রবেশে ট্রেনিং আবশ্যক হয়ে ওঠে।

"প্রতিটি পরিবারই, এমন কি যারা পরীক্ষা-ব্যবস্থা নামক ইঁদুর-দৌড়ের বাড়াবাড়িকে নিন্দা করেন, তাঁরাও যথা নিয়মে চেষ্টা করেন যাতে তাঁদের সন্তানদের মই-এর যতটা সম্ভব উঁচু ধাপে তুলে দেওয়া যায়।

সামগ্রিক দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামাজিক স্তরে জনমত সঠিকভাবে অবহিত নয়, বরং সংক্ষেপে বলতে গেলে তাদের ভুল তথ্য জানানো হয়ে থাকে। এদের দৃষ্টিভঙ্গীটা সম্পূর্ণ "ম্যালথুসীয়" এবং এটা যে শুধুমাত্র বিপথগামী করে বা বিচ্যুতি ঘটায় তাই নয়, এটা একটা সামগ্রিক মতানৈক্যের পথেও ঠেলে দেয়। এটা জনসাধারণকে অদূরদর্শী অর্থনীতির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করতে বা অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে, তাছাড়া উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে তোলে।

"ব্যাপক অংশের স্বীকৃত মত অনুযায়ী 'সমস্ত মানুষই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অবস্থার বৈচিত্র্য তাদের প্রতিযোগী করে তোলার বদলে পরস্পরের সহযোগী করে তোলে। একজনের জন্য কাজ বহুজনের জন্য কাজ সৃষ্টি করে। যখন একদল লোক আছে, যারা হাতা গুটিয়ে উৎপাদন কাজের জন্য প্রস্তুত এবং তাদের সঠিকভাবে ভাগ করা হয়েছে, আর ঋণ ব্যবস্থা এমনভাবে বণ্টন করা হয়েছে যা অর্থ-সংস্থানের পণ্ডিতদের শিউরে তুলতে পারে, তখন ব্যাপারটা মানুষকে কাজে লাগানোর একটা প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

"যদি যুব সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা এবং শিক্ষণ দেওয়া যায়, তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে। পুঁজির প্রয়োজন নিশ্চয়ই হবে, তবে তা বিরাট জাতীয় ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এত উচ্চ পরিমাণে বল প্রদান করবে যে, 'অর্থ' বিনা আয়াসেই পাওয়া যাবে। অর্থমন্ত্রকও বিনা দ্বিধায় আমানতের উপর বিধিনিষেধ শিথিল করতে পারবেন এবং তার ফলে দ্রুত প্রতিদান পাবেন এবং উৎপাদনে মোটা রকম বৃদ্ধি ঘটবে।"

(এডুকেশন অ্যাণ্ড দি ইকোনমিক অ্যাসিমিলেশন অব ইয়ুথ
—অ্যালফ্রেড সভি)

কখন ও কতটা ইংরাজী শিখব ?

ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার

ভাষা-বিতর্কের একটি সুস্থ ফলশ্রুতি হিসাবে আজ আমরা সকলেই একমত যে, সমস্ত মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় নিয়ে আসতে হলে, মাতৃভাষা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো তীব্রতর একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এই নিয়ে যে, কোন স্তর থেকে ইংরাজী পড়ানো শুরু করা হবে। কেউ কেউ বলছেন আজ সরকারী-বেসরকারী কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং উচ্চশিক্ষার জগতে ইংরেজীকে বাদ দিয়ে চলা অসম্ভব। একেবারে ছোটবেলা থেকে ইংরাজী না শেখালে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে আর ভালো ইংরাজী শিখতে পারবে না। অতএব Class VI নয়, Class I থেকেই ইংরাজী শেখানো দরকার। এই মতাবলম্বীরা যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ বা স্থিতাবস্থার উৎকৃষ্টতার উপর বেশী আস্থাশীল হওয়ায় বিতর্কটা প্রায়শই খুব উত্তপ্ত আকার নিচ্ছে।

আমরা সকলেই আমাদের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ দিতে চাই। সুতরাং একটু তাদের দিক থেকে বিষয়টা চিন্তা করা যাক। Spare the rod, spoil the child কথাটা এককালে অনেকেই বিশ্বাস করতেন। ছেলেমেয়েদের কাঠিপেটা করে অভিভাবকেরা বা গুরুদেবরা যা ভাল মনে করেন তাই শেখাবেন। তাদের কি ভালো লাগে বা না লাগে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন নেই।

আনন্দের কথা—এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বহুদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা-বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীরা আজ একমত যে, শারীরিক বা মানসিক জোরজবরদস্তি না করে, তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিশুকে শিক্ষিত করতে হবে, সুদক্ষ মালী যেমন ফুলগাছকে যত্ন করে ফুল ফোটায়।

এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক, একেবারে Class I থেকে ছেলেমেয়েদের ইংরাজী পড়া উচিত কিনা। প্রতিটি শিশুই একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে উঠে। এই পরিবেশে যে মানুষজন আছেন, তাঁদের একটাই ভাষা আছে, যার সাহায্যে তারা জীবনের নানা প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেন। এই মানবিক পরিবেশকে Noam

Chomsky-র কথায় homogeneous speech Community বলা হয়। অধিকাংশের বেলায় এই speech বা ভাষা তার মাতৃভাষা। কিন্তু অনেক সময় তা নাও হতে পারে; যেমন কোন বাঙ্গালী শিশু ছোটবেলায় যদি New York, Paris বা Moscow গিয়ে তার মা বাবার সঙ্গে বাসা বাঁধে, তবে সে অনায়াসে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ বা রাশিয়ান শিখে নিয়ে তার চারপাশের homogeneous speech community-র সভ্য হয়ে যাবে। তার "মাতৃভাষা" হয়ত বাংলাই থাকবে।

যাই হোক, এই homogeneous speech community-র যে ভাষা সেই ভাষাতেই সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে শিশু তার পরিবেশ সম্পর্কে ও নিজের সম্পর্কে নানান রকম জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সেই পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অন্য যে কোন ভাষা তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীর সমস্ত সত্যকারের স্বাধীন দেশে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখানো হয় না। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত শিক্ষা নিয়ে যত কমিশন বা কমিটি হয়েছে তারা সকলেই এই সুপারিশ করেছেন।

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ"। বেবীফুড খাইয়েও শিশুকে মানুষ করা যায়, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। পরন্তু বেশ খানিকটা বিপদের ঝুঁকি থাকে। অতএব গ্রাম-শহর বা গরীব-বড়লোকের প্রশ্ন নয়, সব শিশুর পক্ষেই পরিবেশের ভাষা—যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মাতৃভাষা—ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখানো অবৈজ্ঞানিক, অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায়। পরিবেশ বহির্ভূত ভাষা শিশুর মৌলিক চিন্তা করবার যে প্রবণতা তাকে বাধা দিয়ে সবকিছু মুখস্থ করার দিকে ঠেলে দেয়।

শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে যখন শিশু মাধ্যমিক স্তরে পৌছাবে তখন সে একটি ভাষা শিক্ষার মূল কলা-কৌশল আয়ত্ব করে ফেলেছে। এইবার প্রয়োজনের ভাষা হিসাবে দ্বিতীয় ভাষা ইংরাজী শেখা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে। পরবর্তী সাত বৎসরে যেটুকু ইংরাজী শিখবে তা এখনকার উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের চেয়ে কম হবে না। বরং উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকে এই স্তরেই পাশকোর্সের স্নাতকের মানে পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। সেটা হলো ইংরাজীকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতটা "অপরিহার্য"

করে রাখব। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোর্ট, কাছারি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী-বেসরকারী অফিস ইত্যাদির কাজকর্ম এতই বাঁধাধরা যে ইচ্ছা করলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এগুলোকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে চালানো যায়। দুঃখের বিষয় সেই ইচ্ছাটাই আমাদের যে আছে, তা মনে হয় না। শিক্ষক ছাত্র, জজ-ব্যারিষ্টার, উকিল-মক্কেল, মন্ত্রী-আমলা, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, খরিদ্দার, কেরাণী, কৃষক, শ্রমিক, সবাই বাংলা বলেন ও বোঝেন। অথচ লিখতে গেলেই আমরা একটা বাঁধাধরা ইংরাজী গতের আশ্রয় নিচ্ছি। এই অস্বাভাবিক অবৈজ্ঞানিক পরিবেশ কতদিন থাকবে জানিনা। তবে যতদিন থাকবে ততদিন গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় ইংরাজী জানা লোকের শ্লোগান হয়ে থাকবে, জনগণের জীবনের উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হবে না।

সুখের বিষয় ইতিহাস এক জায়গায় থেমে থাকে না এবং জনগণই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যান। আজকে যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে নীতি নির্ধারণ করছেন তাদের অধিকাংশের শিক্ষার বনিয়াদ সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজ আধিপত্যের যুগে। কালের অমোঘ নিয়মে তাদের শীঘ্রই অবসর নিতে হবে। আজকের দিনের যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীরা, যারা স্বাধীন ভারতে প্রধানতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলছে, তারা শীঘ্রই দেশের হাল ধরবে। সজ্ঞানে তারা মেকলীয় মানসিকতার শিকার হবে না বলেই মনে হয়। এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, তাদের যুগে ইংরাজী আজকের মত অপরিহার্য থাকবে না এবং অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই সকল কাজকর্ম ও লেখাপড়া করার ব্যবস্থা থাকবে। যার ভাল লাগবে বা যিনি প্রয়োজনবোধ করবেন তিনি যে কোন সময় ইংরাজীসহ ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান ইত্যাদি এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা শিখে নেবেন। ইংরাজী না জানলে শিক্ষিত হওয়া যায় না এই কুসংস্কারের ভিত্তিমূলই শুকিয়ে যাবে।

শিক্ষার সমাজ-প্রাসঙ্গিকতা

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী

এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে ভারতবর্ষের অন্যতম জাতীয় সমস্যা হলো নিরক্ষরতার সমস্যা। খুবই দুঃখ ও বেদনাদায়ক হলেও এ কথা সত্য যে বিশ্বের মোট নিরক্ষরের অর্ধেক ভারতবর্ষের অধিবাসী। এই সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে চীনের-প্রাচীরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে হয় তা হলো, বর্তমান সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো। ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় ৮০জন লোক গ্রামে বাস করে। গোটা গ্রামীণ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এখনো মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে আবদ্ধ। এখন তার উপর উপরিস্থাপিত হয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিচালন-ব্যবস্থা। ফলে জাতীয় উন্নয়ন কর্ম-প্রচেষ্টা বাধা পাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। এমনি একটি সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকাংশ লোক আজো দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও পশ্চাৎপদ চিন্তা ভাবনার শিকার হয়ে আছে। সরকারী মতেই দেশের শতকরা ৬০/৬৫টি পরিবার দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সব পরিবারের শিশুরা শিক্ষার যে সামান্যতম সুযোগ রয়েছে তাও গ্রহণ করতে পারে না, কারণ বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হওয়ার সময় থেকেই তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে অংশীদার হতে হয়। এ অবস্থায় ব্যাপক গণশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নিরক্ষতার অভিশাপ সমূলে উচ্ছেদ করা বাস্তবে কতদূর সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তাই শিক্ষা-আন্দোলনকে সার্বিক গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও সম্প্রসারণের আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখা চলে না। এতৎসত্ত্বেও এই কাঠামোর মধ্যে শিক্ষার নীতি ও কাঠামোগত যে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল, যা করার প্রতিশ্রুতি স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বারে বারে ঘোষিত হয়েছে, যা করার প্রতিশ্রুতি সংবিধানের নির্দেশক-নীতিতে স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৪ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা হয়নি।

গণশিক্ষা প্রসারের জাতীয় প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু আছে তার স্বরূপ বুঝতে হলে বুঝতে হবে সে-শিক্ষা এখনো কি ধারা অনুসরণ করে চলছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজস্ব শাসন ও শোষণের স্বার্থে এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা

চালু করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী শিক্ষা ও ভাবধারায় শিক্ষিত একটি বশংবদ শ্রেণী তৈরী করা, যারা যোগান দেবে শাসন ও শোষণ যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রশাসক, বিচারক, ম্যানেজার, হিসাব-রক্ষক, কেরাণী, সেলসম্যান, দালাল ইত্যাদি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫৪ বৎসর পরও কি আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা চাকুরী পাওয়ার ছাড়পত্রের পর্যায় থেকে তুলে এনে তাকে জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছি? কোটারী কমিশনকেও তাই সক্ষোভে মন্তব্য করতে হয়েছে, "In our opinion, therefore, no reform is more important or more urgent than to transform education to endeavour to relate it to the life, needs and aspiration of the people and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realisation of our national goals."

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের শিক্ষা এখনো চাকুরী পাওয়া ও চাকুরী করার যোগ্যতার ছাড়পত্রের গণ্ডি অতিক্রম করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের হাতিয়ারের পর্যায়ে উঠতে পারেনি বা উঠানো হয়নি। তাই এখনো আমাদের দেশে কোন্ শিক্ষা ভাল কোন্ শিক্ষা মন্দ তা বিচার করা হয় এই যুক্তি দিয়ে—এ শিক্ষা নিলে ভাল একটা চাকুরী পাওয়া সহজ হবে তো।

গ্রামের একজন গরীব কৃষক বা খেত-মজুরকে যদি প্রশ্ন করা হয় "কিগো, তোমার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছ না কেন?" অর্থনৈতিক ও সামাজিক কয়েকটি অসুবিধার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই অন্য আর একটি উত্তর যা তারা দেয় তা হলো, "না বাবু, পড়েশুনে কি হবে? ছেলে তো বাবু বনে যাবে। তখন গায়ে-গতরে খাটতে লজ্জা বোধ করবে। আর এই বাজারে যেখানে হাজার হাজার ভদ্রলোকের ছেলেরা বেকার হয়ে বসে আছে, সেখানে একটা চাকুরী পাওয়ার ভরসাই বা কোথায়? তার চেয়ে এখন থেকে জাত-পেশায় লেগে থাকলে আখেরে করে খেতে পারবে।"

কথাটা সম্পূর্ণ যুক্তি নির্ভর না হলেও, এতে বাস্তব সত্য যথেষ্ট রয়েছে। কারণ আমাদের সমাজে এখনো লেখাপড়া শেখার সঙ্গে চাকুরী পাওয়া ও

চাকুরী করার ব্যাপারটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাইতো আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বাপ-মায়া পড়াশুনায় অমনোযোগী ছেলেমেয়েদের এই বলে শাসন করেন—"লেখাপড়া শিখবি না তো খাবি কি করে?" যেন লেখাপড়া শিখলেই যা-হোক একটা চাকুরী পাবে। তখন খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। তাইতো আমাদের দেশে অন্যতম প্রবাদ-বাক্য "লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে"। তাই দেখা যায়, আমাদের সমাজের প্রায় সকলেরই এই ধারণা যে লেখাপড়া শেখার মূল উদ্দেশ্য হলো চাকুরী পাওয়ার জন্য একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করা। আরো একটু উপরে যারা ভাবেন তাদের কাছে তা হলো, এই অসম প্রতিযোগিতার যুগে কোন-মতে আর দশটা ছেলেমেয়েকে পিছনে ফেলে তার নিজের ছেলে যাতে একটা ভাল চাকুরী পেয়ে যেতে পারে তার জন্য গোড়া থেকেই তালিম দেওয়া। যার ফলশ্রুতি হলো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার জন্য বাপ-মায়ের আপ্রাণ আকুতি। অথচ শিক্ষা যে চাকুরী ছাড়াও সাধারণভাবে সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হতে পারে এবং জীবন-সংগ্রামের যে-কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি হতে পারে, সে উপলব্ধি নাই বললেই চলে। এর জন্য অবশ্য সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ বাস্তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৪ বৎসর পরও সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ধারাকেই সযত্নে লালন-পালন করা হচ্ছে। যে-হেতু সমাজের শাসক ও শোষক শ্রেণী ভাল করেই জানে 'শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা আনে বিপ্লব।'

পুঁজিবাদী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—উৎপাদন শ্রম ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে বিচ্ছেদ জীইয়ে রাখা। আর তারই স্বাভাবিক ফল হলো, সমাজের উৎপাদন-শ্রমের একটি বিরাট অংশ উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে সফলভাবে যুক্ত হতে না পেরে অপচয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বাস্তবে দেখা যায়, একটি বিরাট সংখ্যক বেকার, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সীমিত সুযোগের মধ্যেও যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে এমন সব শিক্ষিত বেকার। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে এই অবস্থায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তব সম্মত নয়। এই ধারণার মূলে যে-কারণগুলি রয়েছে তার প্রথমটি সম্বন্ধে আমরা উপরে আলোচন করেছি—যা হলো, শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে চাকুরী পাওয়ার ছাড়পত্র হিসাবে মনে করা। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি একটি মিথ্যা সর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সেই সর্তটি হলো—বর্তমানে প্রচলিত

পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। ইতিহাস কিন্তু বারে বারে এই সর্তকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। দাস-সমাজ-ব্যবস্থার যুগে দাস-মালিকরা মনে করতো তাদের এই সমাজ-ব্যবস্থা নিয়তি নির্ধারিত। ক্রীতদাসরা সমস্ত উৎপাদন-শ্রম করবে, কেবলমাত্র বেঁচে থাকার সর্তে; আর তাদের সেই শ্রমের ফসল নিয়ে তারা আনাদি অনন্ত-কাল ধরে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাবে। কিন্তু তাদের শত-সহস্র বিশ্বাস থাকা সত্বেও সেই ব্যবস্থা টিকে থাকেনি। সামন্তপ্রথার সমাজ-ব্যবস্থাকে পথ করে দিয়ে দাস-ব্যবস্থাকে একদিন সরে দাঁড়াতে হয়েছে। আবার সামন্ত-প্রভুরা ভেবেছিলেন তারা ঈশ্বরের বরপুত্ররূপে অনাদি অনন্তকাল ধরে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাবেন। সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজকেও একদিন পুঁজিবাদী সমাজের কাছে হার মেনে সরে যেতে হয়েছিল। আবার ইতোমধ্যে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশের উপর থেকে পুঁজিবাদকে তার পাত্তারী গুট'তে হয়েছে। সেখানে কায়েম হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সেখানে পুঁজি ও শ্রমের বিচ্ছেদ দূর হয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের উপর সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে জাতীয়-শ্রমকে আর অপচয়ের পচাগহ্বরে নষ্ট হতে হয় না।

শিক্ষা কেবলমাত্র উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবেই কাজ করে না, কি করে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের শ্রম-শক্তির সার্বিক ও সকল প্রয়োগ সম্ভব তার পথনির্দেশের ইঙ্গিতও বহন করে। তাই তো সমাজের শাসক ও শোষকশ্রেণী গণশিক্ষার প্রশ্নটিকে নানা ছল-চাতুরীতে এড়িয়ে চলে।

শিক্ষার অধিকার মানুষের মৌল অধিকারগুলির অন্যতম। তা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা নীতি বিরুদ্ধ। আর শিক্ষা কোনক্রমেই গতানুগতিক ঔপনিবেশিক ধাঁচের গোলামী পাওয়া ও গোলামী করার উপযুক্ততা অর্জনের শিক্ষা নয়। তাই শিক্ষার উপর সার্বজনীন অধিকারের বিস্তার যেমন ঘটাতে হবে, তেমনি তাকে করতে হবে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের মূল প্রয়োজন ও উপযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; চাকুরী পাওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নয়। তবেই আজো পর্যন্ত যারা শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন, বরং শিক্ষার প্রতি বিমুখ, তারা শিক্ষা নিতে উৎসাহিত হবে, চাকুরী পাওয়ার লোভে নয়, নিজস্ব বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থে। আর

একমাত্র তখনই শিক্ষা জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাতিয়ারের শক্তি অর্জন করবে। শিক্ষা হবে কোটারী কমিশনের সুপারিশ মতো, "a powerful instrument of social, economic and cultural transformation".

কার্যক্ষেত্রে তা করতে হলে অবিলম্বে শিক্ষার বিষয় ও চরিত্রগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার কাঠামোগত পরিবর্তন এনে তাকে গণশিক্ষার পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। একদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ মানুষের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ যেমন সম্প্রসারিত করতে হবে, তেমনি তার বিষয় ও পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনে শিক্ষাকে যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক, কুসংস্কার মুক্ত আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলতে হবে, যেন দেশের প্রতিটি লোক ভারতবর্ষের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবীয় মূল্যবোধসহ সক্রিয় ও সফল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

১। ব্যাপক গণশিক্ষার প্রসার ঃ

গণশিক্ষার সাবজনীন প্রসারের প্রশ্নে প্রথমেই যে প্রতিবন্ধকতার কথা মনে পড়ে তা হলো, বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাপক গণশিক্ষা প্রসারের প্রাথমিক সর্ত হবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে শিক্ষাই মানুষকে সমাজ-সচেতন করে তোলে এবং সমাজ-সচেতন মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টাই সমাজের ক্রান্তিকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে। সুতরাং সমাজ-ব্যবস্থার কাম্য পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সমাজের শোষিত বঞ্চিত পশ্চাৎপদ মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

গণশিক্ষা প্রসারের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক অনেকাংশে সামাজিক। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণের ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর শোষিত বঞ্চিত লোকেরা বংশপরম্পরায় অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে শোষিত বঞ্চিত হয়ে ধরেই নিয়েছে যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি তাদের জন্য নয়। শোষক শ্রেণীও নানাভাবে তাদের সেই কথাই বুঝাতে চেয়েছে। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষার মধ্যে তারা তাদের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান খুঁজে পায় না। তারা দেখতে পায় যে, তাদের ঘরের

ছেলেমেয়েরা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পড়াশুনা করে নিজেদের পরিবার ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে চলার এবং বংশগত পেশার মধ্যে বেঁচে থাকার মানসিকতা হারিয়ে দাস্যবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার পরিপ্রেক্ষিতে গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যালয় গড়ে তুললেই শুধু হবে না, প্রয়োজনীয় প্রচার ও পরামর্শ দিয়ে তাদের মনে শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহ জাগাতে হবে। আবার প্রচলিত বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করলেই শুধু চলবে না, সেই সঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষা, নন-ফরম্যাল বা প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার একটি কার্যকরী কাঠামো ও সংগঠনও গড়ে তুলতে হবে।

এতদিন আমাদের দেশের শিক্ষা-সচেতন, শিক্ষানুরাগী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য তাদেরই প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, সরকার শুধু অনুমোদন দিয়ে ও কিছু কিছু অর্থ-আনুকুল্য দিয়েই তার কর্তব্য সমাধা করেছে। ফলে শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও আদিবাসী অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ ছিল খুবই নগন্য। সেইসব অবহেলিত অঞ্চল চিহ্নিত করে সেখানে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। অসম ও পরিকল্পনা বিহীন বিকাশ বন্ধ করতে পারলে অর্থ-সামর্থের উপর চাপও অনেকটা কমে যাবে।

যেহেতু এখনই সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাই এই ব্যবস্থাতেও অনেকেই নানা কারণে প্রথাগত শিক্ষার পরিধির বাইরে থেকে যাবে। তাদের জন্য ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষা এবং প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক দায়-দায়িত্বের বোঝা বহন করার পর যে সামান্য সময় তারা দিতে পারবে, তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রেখে সেই সময়ে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন বার বার বলেছে যে, একই শ্রেণীতে একাধিক বৎসর আটকে থাকা এবং পড়াশুনা শুরু করার ২/১ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ফলে এক বিরাট জাতীয় অপচয় ঘটে। দেখা যায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০/৩৫ জন মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে যায়, বাকিরা মাঝপথে বিভিন্ন সময়ে পড়শুনা ছেড়ে দেয় এবং পরে চর্চার অভাবে আবার নিরক্ষরে পরিণত হয়। এই ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ, প্রাথমিক স্তরে ইংরাজীর মতো একটি বিজাতীয় ভাষা

শেখার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় প্রথম থেকে। এছাড়া পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ত্রুটিও অনেকাংশে এর জন্য দায়ী।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিরাট সংখ্যক বেকার থাকে তা আগেই বলা হয়েছে। তাই এখানে কোন কাজে নিয়োগের সময় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নাম করে অনেককেই 'অনুপযুক্ত' বলে বাতিল করতে হয়। পুঁজিবাদী সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারটি প্রায় অনুরূপভাবেই পরিচালিত হয়। প্রতি বৎসর প্রতিটি শ্রেণীতে বাৎসরিক পরীক্ষার পর বেশ কিছু শিশুকে অনুত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তরে এ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমে বৎসরান্তে বাৎসরিক পরীক্ষার বদলে গোটা বছর ধরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী-ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতেই কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য-উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।"

যে দেশের সাধারণ মানুষের একটি বৃহত্তম অংশ শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে এমনিতেই নির্লিপ্ত, চাই কি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, সে-দেশে সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-পরিধির মধ্যে টেকে আনতে এবং তাদের মনে শিক্ষার সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ বছর যুক্ত থাকার মানসিকতা গড়ে তুলতে উপরোক্ত ব্যবস্থা খুবই সহায়ক হবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া এই ব্যবস্থা শিশু মনোস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্মতও বটে। পরীক্ষা হবে মূল্যায়নের সাহায্যে পশ্চাৎপদতা নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী-ব্যবস্থা নিরূপণের হাতিয়ার। পরীক্ষা কখনোই ছাটাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হবে না।

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, একটি সার্বিক অগ্রগমণের কর্মধারা। একটি শিশু যদি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাঁচ বছর একটি বিদ্যালয়ের সমাজ-পরিবেশে চলাফেরা করে, তবে তার নিজের অজ্ঞাতেই তার মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক বিকাশ হতে বাধ্য। শিক্ষার্থী ইতিহাসের ক'টি সাল তারিখ নির্ভুলভাবে মুখস্থ করতে পারলো, ক'পাতা বিজ্ঞান মুখস্থ করতে পারলো তা কখনই তার জ্ঞান, চিন্তা ও অনুভূতি বিকাশের মাপকাঠি হতে পারে না। সার্বিকভাবে জ্ঞান ও

দক্ষতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতি ও মূল্যবোধে কতটা বিকাশ ঘটলো তা হবে মূল্য বিচার্য্য।

শিক্ষাকে সমাজ ও জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করা।

এই প্রবন্ধের শুরুতেই আমরা দেখেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা সমাজের বৃহত্তম অংশের মানুষের সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই সাধারণ মানুষ এর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উৎসাহ বোধ করে না। যে শিক্ষা তাদের ছেলেমেয়েদের মনে কেবল দাস্যভাব এনে দেয়, চাকুরী পাওয়া ও চাকুরী করার মনোভাব গড়ে তোলে এবং চাকুরী না পেলেই জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল এমনি অনুভূতি এনে দেয়, সেই শিক্ষাকে কখনই সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায় না।

সমাজের প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ভাবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। তা সেই সম্পর্ক মজুরির বিনিময়ে পরের জন্য শ্রম করাই হোক, বা নিজস্ব প্রচেষ্টায় নিযুক্ত স্বাধীন পেশা বা উৎপাদনমূলক কাজ বা ব্যবসাই হোক। শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যেন সকল শ্রেণীর লোকই তার মধ্যে এমন সব উপাদান খুঁজে পাবে, যা তারা নিজ নিজ কর্মোদ্যমে আরো সফল ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে এবং তা করতে গিয়ে তারা যে বাঁধার মুখোমুখি হবে তার স্বরূপ তারা বুঝতে পারবে এবং সেই বাঁধা দূর করতে হলে তাদের কি করতে হবে তাও তারা বুঝতে পারবে।

আমাদের দেশ একটি উন্নয়নকামী দেশ। উন্নয়নের প্রাথমিক সর্ত হলো, বৈষয়িক উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সুসম বণ্টন। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের উপাদানগুলির—যার মধ্যে দেশের বিরাট শ্রমশক্তি অন্যতম—সার্থক, সফল ও সার্বিক প্রয়োগ। আবার এর জন্য প্রয়োজন দেশের মানুষকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ উৎপাদক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষিত করে তোলা। আর দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন, সমাজের বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান তাদের সামনে তুলে ধরা, যাতে করে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে কাম্য সামাজিক-বিকাশের স্বার্থে কি করা প্রয়োজন। তবেই জাতীয় উৎপাদনের অন্যতম ও প্রধানতম উপাদান দেশের শ্রমশক্তি সার্থকভাবে তাদের শ্রমকে প্রয়োগ

করতে পারবে এবং উৎপাদন সম্পর্কের কাম্য-পরিবর্তনের জন্য ক্রান্তিকারী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেণী-দ্বন্দ্বের জ্ঞানের সমার্থবোধক। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব আছে ও থাকবে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। তবু যারা একে আড়াল করে রাখতে চায়, বা তাকে অপ্রয়োজনীয় বলে দেখাতে চায়, তারা হয় প্রচলিত ব্যবস্থার অন্ধ স্তাবক, নয়তো উদ্দেশ্য-মূলকভাবে শাসক ও শোষক শ্রেণীর শোষণ-বঞ্চনার স্বপক্ষে সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতে ব্যস্ত। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমবিকাশমান। প্রতিনিয়ত তাতে নব নব সংযোজন ও সংশোধন হচ্ছে, উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে উন্নীত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নব নব উপাদান যুক্ত হচ্ছে, তার নব নব বিকাশ ঘটছে। অথচ উৎপাদন সম্পর্ক যা আছে তাই থাকবে, তার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আসবে না, একথা একমাত্র বাতুলরাই বলতে পারে।

যুগে যুগে সামাজিক উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমকারী মানুষরাই একদিকে যেমন উৎপাদন পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন এনেছে, উৎপাদনের কলা-কৌশলে নানা বৈচিত্র্য ও বিকাশ ঘটিয়েছে, তেমনি তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তারা বুঝতে পেরেছে উৎপাদন সম্পর্কের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা। আর তখনই সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন তাদেরই সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে ঘটেছে প্রয়োজনীয় সমাজ-বিপ্লব।

তাই শিক্ষাকে করতে হবে সব দিক থেকে যুগোপযোগী এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থা ও আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। তবেই সেই শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তা সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারবে, সামাজিক উৎপাদনে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারবে। তখন শিক্ষা হবে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের একটি অপরিহার্য্য উপাদান যা গ্রহণ করতে আজকের দিনে শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন অংশও আগ্রহ বোধ করবে।

অপর দিকে সেই শিক্ষা মানুষকে করে তুলবে সমাজ সচেতন। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজের শ্রমশক্তির একটি বৃহত্তর অংশকে বেকার রেখে, জাতীয় শ্রম-শক্তির বিরাট অপচয় ঘটিয়ে সমাজের যে নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ অধিকাংশের

উপর শোষণ-বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে সচেতন মানুষ জাতীয় শ্রম-শক্তির সফল ও সার্বিক প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত করে দিতে এগিয়ে আসবে।

শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও কুসংস্কার মুক্ত করা ঃ

গণশিক্ষার পাঠক্রমকে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার ও কার্য্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত তথ্য ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রয়োগধর্মী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার অন্যতম কাজ হলো, যুগে যুগে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে গিয়ে যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং যা পরবর্তীকালে সময় ও প্রয়োগের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত করা। একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা, তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা, যাদের নিরক্ষর বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, তাদের অনেকেই সমাজ ও জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। তাদের প্রধান অভাব হলো তাদের অক্ষর জ্ঞান নেই। অবশ্য বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত তাদের এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় এমন অনেক উপাদান থাকে যা পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা পরিমার্জিত না হওয়ায় নানা প্রকার সংস্কাররূপে, এমন কি কুসংস্কাররূপে চলে আসছে। প্রচলিত ধর্ম-সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংস্কারের যে বিরাট পরিমণ্ডল আজও আমাদের সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির উপরিসৌধকে ঘিরে রেখেছে তাকে বাস্তব বিজ্ঞান ও কার্য্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তি বিচারে পরিশোধিত করার কাজটি এখনই শুরু করাদরকার।

এখনো দেখা যায় প্রথাগত শিক্ষার জন্য যে সব বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হয় তাতে নানা প্রকার অসংস্কৃত বা ভুল তত্ত্ব বা তথ্য, লোকশ্রুতি, এমন কি কুসংস্কারের উপাদানও বর্তমান। ইতিহাসে কিছু কিছু রাজা-বাদশার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যমূলক কাজকর্ম, যুদ্ধ বা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে ইতিহাসের চালিকা-শক্তি হিসাবে দেখানো হয়। রাজা-বাদশারা যে বিলাস-বহুল বা খাম-খেয়ালীপূর্ণ জীবন যাপন করতো তার প্রতি সম্ভ্রমবোধ জাগানোর উপাদান পরিবেশন করা হয়। অথচ ইতিহাস যে প্রকৃত অর্থে মানুষের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস, শ্রমকারী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, তা আড়াল করে রাখা হয়। ফলে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বেশ কিছু আপ্তবাক্য, বেশ কিছু কার্য্য-কারণ সম্পর্কবিহীন উপাদান এবং বিকৃত ও পরিত্যক্ত তত্ত্ব ও তথ্য থেকে যায়। তাই

গণশিক্ষার পাঠক্রমকে অবিলম্বে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের আলোকে পরিমার্জিত করার কাজটি অত্যন্ত জরুরী।

কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার মতোই ধর্মান্ধতা, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা মানব-সমাজের কয়েকটি বড় শত্রু। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শাসক ও শোষক-শ্রেণী শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষকে বিচ্ছিন্ন, এমন কি পরস্পরের শত্রু হিসাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মদত দেয়। তাই গণশিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হবে উপরোক্ত অভিশাপগুলি থেকে সমাজকে মুক্ত করে জাতীয়-সংহতিকে জোরদার করা এবং মানুষের মধ্যে জাতীয় ও মানবীয় মূল্য-বোধের বিকাশ ঘটানো। আবার মানব সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশে দেশে দেশে শ্রমকারী মানুষ যে ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও একাত্মতা জাগানো। যাতে করে তার মনে সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা, জাতিদম্ভ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বোপরি মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করার ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণার অনুভূতি থেকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণার বিকাশ ঘটে।

শিক্ষাকে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ায় পরিণত করা ঃ

আমাদের দেশে একটি কথা আছে "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি"। এই কথাটি অন্যতম বাস্তব ইঙ্গিত এই যে, মানুষের শিক্ষা শুধু প্রথাগত শিক্ষার সংকীর্ণ সময়-গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অংশীদার হিসাবে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর কোনটা একেবারেই নতুন বা অভিনব, আবার কোনটা বা ইতোমধ্যে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসংস্কৃত, সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করতে সাহায্য করে।

প্রথাগত শিক্ষার অন্যতম কাজ হলো, শিক্ষার্থীকে লিখতে-পড়তে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করা। প্রথাগত শিক্ষার সাফল্যের জন্য তো বটেই, জীবনব্যাপী শিক্ষার দিক থেকেও এই লিখতে-পড়তে পারার দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতার বর্তমান অভাবনীয় বিকাশের যুগে মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আজ এমন এক সমৃদ্ধ স্তরে পৌঁছেছে এবং প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এমন সব নব নব সত্য উৎঘাটিত হচ্ছে যা কোন একটি মানুষের নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতায় তার কণামাত্র অর্জন করা সম্ভব নয়। অথচ মানুষকে তা জানতে হবে।

মানবজাতির বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথমদিকে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উৎপাদন কলা-কৌশল পুরুষানুক্রমে মুখেমুখে উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে যেতো। কিন্তু ক্রমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের জন্য অবিকৃত অবস্থায় রেখে যাওয়ার তাগিদেই লিপির আবিষ্কার হয়। লিপির আবিষ্কার ও প্রচলন তাই মানব-ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আজ সেই লিপির অভাবনীয় বিকাশ ও মুদ্রণ ব্যবস্থার বিকাশের ফলে মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাণ্ডার এক অফুরন্ত ও সুসমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। তাই লিখতে-পড়তে শিখে সেই ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার বিষয়টি শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে গণ্য হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষার সীমিত সময়টি বলতে গেলে মানব সভ্যতার অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ করার প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। প্রকৃত শেখা শুরু হয় তার পরে। তাই "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি" এই বাক্যটি অবশ্য করণীয় একটি নির্দেশ।

শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ায় পরিণত করতে হলে শিক্ষার্থীকে যেমন একদিকে নিজস্ব জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ইতোমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে তাকে সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে, আবার তাকে তৈরি করে দিতে হবে এমন ভাবে যেন সে নিজস্ব প্রচেষ্টায় বাস্তব অভিজ্ঞতার বাইরের জ্ঞান মুদ্রিত পুঁথি-পুস্তকের সাহায্য নিয়ে অর্জন করে এগিয়ে যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গণশিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের পাঠাগার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। যেন এইসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হিসাবে গণ-শিক্ষার ধারাকে সমাজের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে পারে, যেন জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারাকে প্রয়োজনীয় উপাদান যুগিয়ে যেতে পারে।

গণশিক্ষায় ভাষা ঃ

শিক্ষার কথা এলেই ভাষার কথা এসে যায়। কারণ ভাষার মাধ্যমেই আমরা ভাব গ্রহণ করি, ধারণ করি, আবার ভাষার মাধ্যমেই তা প্রকাশ করি। ভাবের আত্মিকরণ, চিন্তন, মনন সমস্ত প্রক্রিয়াতেই ভাষার স্থান প্রধান। তাই প্রশ্ন হলো গণশিক্ষা চলবে কোন ভাষায় ?

বিশ্বের যে কোন স্বাধীন দেশে এই বিষয়টি নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কারণ সেখানে শিক্ষার সমস্ত স্তরে মাতৃভাষা অবিসংবাদিতভাবে শিক্ষার মাধ্যম

হিসাবে স্বীকৃত। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে সেই সব দেশে কোথাও মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়ানো হয় না। কিন্তু আমাদের মতো দেশ, যারা একসময় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশ হিসাবে দীর্ঘদিন শোষিত বঞ্চিত হয়েছে, সেইসব দেশে সেই আমলে স্বাভাবিকভাবেই শাসকজাতির ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার পর অবশ্য অনেক পুরানো ঔপনিবেশিক দেশ নিজেদের মাতৃভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে সেই প্রক্রিয়াটি এখনো সমাধা হয়নি, বরং মনে হয় বিজাতীয় ভাষার দাসত্বের বোঝা যেন আরো চেপে বসতে চাইছে।

তার তা হচ্ছে কায়েমী স্বার্থের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত ও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার দেরীতে হলেও প্রাথমিক স্তরে একটি বিজ্ঞান সম্মত ভাষানীতি ঘোষণা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের তল্পীবাহক কিছু শিক্ষাবিদ নানা অছিলায় তার বিরোধিতা শুরু করেছে। এদের মধ্যে অনেককেই দেখতে পাই যারা কিছুদিন আগে রবীন্দ্রপ্রেমিক সেজে 'সহজ পাঠ' উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই মিথ্যে ধোঁয়া তুলে বাজার মাত করার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছিলেন, এগারো বৎসর পর্যন্ত মাতৃভাষার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা উচিৎ নয়। অথচ আজ এইসব মেকী রবীন্দ্রপ্রেমিকরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করছে না।

যাই হোক গণশিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষা হবে তাতে আর বিতর্কের অবকাশ নেই। ভাষা-শিক্ষা পরিবেশ নির্ভর। কোন একটি শিশু জন্মের পর থেকে যে ভাষার পরিবেশে বাস করে, স্বাভাবিকভাবে সেই ভাষা অনায়াসে কোন বাড়তি প্রচেষ্টা ছাড়াই আয়ত্ব করে ফেলে। আর সমস্ত দেশে সেই ভাষা সব সময়ই হয় সেই দেশের মাতৃভাষা। সুতরাং শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে গণশিক্ষার ভাষা অবশ্যই মাতৃভাষা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে শিক্ষার উচ্চতর স্তরে যদিও কোন একটি আধুনিক ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়ানো যেতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে কোনমতেই মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার বোঝা শিক্ষার্থীদের উপর চাপানো চলবে না। এর স্বপক্ষে শিক্ষাতত্ত্ব, শিশু মনোস্তত্ত্ব ও অন্যান্য অনেক কিছুর উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয়-ভাষা শিক্ষা : বিতর্কের নানা দিক

শ্রীপবিত্র সরকার

১. ভূমিকা

সম্প্রতি (১৯৭৯ সালের শেষ দিকে) পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার প্রস্তাব করেছেন যে, এ রাজ্যের শিশুকে প্রাথমিক স্তরে, অর্থাৎ প্রাইমারী স্কুলের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, তার L1[১] বা মাতৃভাষার অতিরিক্ত কোনো দ্বিতীয় ভাষা বা L2 শিখতে হবে না। ভাষা ছাড়া সে অন্যান্য বিষয় যা পড়বে—গণিত, ভূগোল, ইত্যাদি—তা যে সে মাতৃভাষাতেই শিখবে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র—তাই এখানকার শিশু দীর্ঘদিন ধরে শিখে আসছে। কাজেই কোন্ ভাষার বাহন বা মিডিয়াম-এ শিক্ষা হবে, তা নিয়ে আপাতত কোনো বিতর্ক নেই। প্রস্তাবটি শুধু এই বলছে যে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভাষা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের শিশু একটি মাত্র ভাষাই শিখবে। তার L2 শিক্ষা শুরু হবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে।

ইস্কুলগামী পশ্চিমবাংলার শিশুর L2 বলতে সাধারণভাবে ইংরেজি ভাষাকেই বোঝায়[২]। এই প্রস্তাবের বলে ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভকে বেশির ভাগ প্রাথমিক ইস্কুলের ক্ষেত্রে তিন বছর পিছিয়ে দেওয়া হল। এখন এখানে শিশুর ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় ক্লাস থ্রি থেকে—তার মধ্যে, বলা বাহুল্য, ইংরেজি বাহনের ইস্কুলগুলিকে ধরা হয় নি। সেখানে ক্লাস ওয়ানের দু'এক বছর আগে থেকেই, অর্থাৎ প্রিপারেটরি, কে. জি. (কিণ্ডারগারটেন), নার্সারি, ট্রানজিশন ইত্যাদি নামের ক্লাসে ইংরেজি শেখানো হতে থাকে। কিন্তু যে-সব প্রাথমিক স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে তাদের মোট সংখ্যা ৪৭,০০০-এর মতো। সে-সব স্কুলেই এখন থেকে আর ইংরেজি পড়ানো হবে না। যতদূর জানি, এবার থেকে মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মোট সাত বছর আবশ্যিক ভাবে ইংরেজি পড়বে।

এ প্রস্তাব কিন্তু বিশেষভাবে বামফ্রন্ট সরকারের নয়। কাজেই এর মধ্যে বামপন্থী বা বৈপ্লবিক কোনো অভিসন্ধি আছে, একথা উচ্চারণ করা যত সহজ প্রমাণ করা তত সহজ নয়। এ পর্যন্ত নিযুক্ত প্রায় সমস্ত ভারতীয় শিক্ষা

কমিশন প্রায় একবাক্যে বলেছেন যে, প্রাথমিক স্তরে শিশু কেবল মাতৃভাষা শিখবে—ঐবছর ক'টায় সে-ভাষার কোনো প্রতিযোগী থাকবে না। ১৯৪৮-৪৯-এর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেবল মাতৃভাষা শেখানোর সুপারিশ করেছিলেন। ক্লাস সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত মাতৃভাষার সঙ্গে শিশু federal language বা জাতীয় ভাষা শিখবে—এমন বলা হয়েছিল। ১৯৫৩-র মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক স্তরেই ইংরেজিকে আবশ্যিক করার কথা বলেছেন, এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে শিশুকে ইংরেজি ও জাতীয়-ভাষা শেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯৫৭-র সরকারি ভাষা কমিশন (বি. জি. খের-এর সভাপতিত্বে) প্রাথমিক স্তরে শিশুকে ইংরেজি শেখানো অপচয় বা waste বলে বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি ১৯৬৪-৬৬-র কোঠারি কমিশনের স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত হল higher primary stage-এ (Class V-VII) L2 অর্থাৎ ইংরেজি শেখানো যেতে পারে। এই কমিশন ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে একটি স্টাডি গ্রুপ-এর মত উদ্ধার করে বলেছেন যে, এখন যে ক্লাস থ্রি থেকে শিশুকে ইংরেজি শেখা শুরু করতে হয় তা educationally unsound—এবং সে সিদ্ধান্তে কমিশন তার পূর্ণ সম্মতি জানাচ্ছেন। কমিশনের সুপারিশ হল, পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানো আরম্ভ করতে হবে (দু'একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র বাদে)। তবে কমিশন এও লক্ষ করেছেন যে, গ্রামের দিকে ক্লাস এইটের আগে ইংরেজি শেখানো শুরু করা সম্ভব হবে না।

অর্থাৎ, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত—এবং তার সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি হিসেবেই গণ্য। সেই অনুযায়ী অন্যান্য সব প্রদেশেই প্রাথমিক পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গই বরং একটু পিছিয়ে ছিল। কেন্দ্রীয় স্তরে যে-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যখন তা বলবৎ করার প্রশ্ন উঠছে তখন বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধেই আক্রমণ কেন পরিচালিত হচ্ছে, তার বিশুদ্ধ কারণ বোঝা দুষ্কর।

যাঁরা আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আছে, আর আছেন কিছু ব্যক্তি—কিছু প্রবীণ বুদ্ধিজীবী। রাজনৈতিক দলগুলি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করে থাকেন। কিন্তু অতীব বিস্ময়ের কথা হল—পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও ইংরেজিকে

প্রথম শ্রেণী থেকে পাঠ্য করার জন্য এঁদের কোনো দলই আন্দোলন করছেন, এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোথাও স্বেচ্ছায় কারাবরণ বা আইন অমান্য ঘটছে না, কাগজপত্রে প্রতিবাদ ঘোষিত হচ্ছে না। গুজরাটে কি পোস্টার দেখেছে কেউ এ বিষয়ে? বিহারে? অন্ধ্রে? উত্তর-প্রদেশে? এসব জায়গাতেও প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি নেই তা তো সকলেই জানেন (পরে দেখুন)। তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন করার কারণ কী? ঐ তথাকথিত সর্বভারতীয় দলগুলির রাজনীতির এই চরিত্রহীন চেহারাটা এতেই বেশ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এবার বুদ্ধিজীবীদের কথা একটু বলি। সকলেরই মনে আছে স্বাধীনতার কিছু পরেই আগেকার প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, সম্ভবত ১৯৪৯ থেকে। যেসব প্রবীণ বুদ্ধিজীবী এযাত্রায় এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এ শৌখিনভাবে আইন অমান্য করে পুলিশের গাড়িতে উঠেছেন, তখন তাঁদের বয়স আরো কম ছিল, উৎসাহ অনেক বেশি ছিল। তখন কিন্তু এঁদের কারাবরণ করা দূরে থাক, টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করতে শোনা যায় নি। আবার ১৯৬০-এর গোড়ায় যখন তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি শেখানো এগিয়ে নিয়ে আসা হল, তখনও কি এঁরা বলতে পারতেন না যে, ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না—একেবারে ক্লাস ওয়ানেই নিয়ে যাওয়া হোক? নইলে বাঙালি শিশুদের সবনাশ হবে। কই তখন তো তাঁদের কণ্ঠস্বর তেমন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এঁদের একজন, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো ছড়াই ছাপিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে—

ইংরেজির পুচ্ছে
ডাল ধরেছি উচ্চে;
নইলে কে আর
করত কেয়ার?
এখন সবাই পুছ্ছে।
নিয়েছি ঝুলি ভিক্ষার:
উচ্চারণে হিক্কার
ভাবটা থাকে,
তারই ফাঁকে
বাংলাকে দিই ধিক্কার!

[হিকোরি চিকোরি]

এখন ইংরেজির পক্ষ নিয়ে তিনি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ঐ ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। এখন তাঁর ঐ ছড়া তাকে প্রেতের মতো তাড়া করে বেড়ায় না তো ?

রাজনৈতিক দল ও তাদের আহ্বানে সমবেত বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিকতা এবং অ্যাকাডেমিক বা বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের সংশয় কোথায়—উপরে তা নির্দেশ করেছি। কিন্তু এঁদের অভিসন্ধি এবং তত্ত্বের ছদ্মবেশে অসৎ রাজনীতিকে মুড়ে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেষণ করাটা দেখানোই যথেষ্ট নয়, এঁদের ঐ তথাকথিত শিক্ষাতত্ত্বে ভুল কোথায়—তাও দেখানো দরকার। এ প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, এবার এই বুদ্ধিজীবীরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখারও পক্ষপাতী নন। এঁরা অধিকন্তু দাবি করছেন যে, ইংরেজি শিক্ষা এখন আরো এগিয়ে এনে একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকেই শুরু করতে হবে—যেমন করা হত স্বাধীনতার পর দু-এক বছর। এঁদের দাবির মোট হিসাব হল—প্রাথমিকের চার, মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিকের আট এবং স্নাতক স্তরের দুই—মোট এই চোদ্দ বছর পশ্চিমবঙ্গের শিশুকে সর্বজনীনভাবে (ইউনিভারসালি—সকলকে শিখতে হবে) এবং আবশ্যিকভাবে (কমপালসারিলী—সকলকে শিখতেই হবে) ইংরেজি শিখতে হবে। নানা স্তরে ইংরেজি ভাষা (এবং সাহিত্য) শেখানোর পক্ষে এঁদের নানারকমের যুক্তি আছে। মূলত প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি কেন শেখানো হবে সেই কথা বলতে গিয়ে এঁরা যেসব যুক্তি দেখান সেগুলিকে তাত্ত্বিক (থিওরিটিক্যাল) এবং সামাজিক উপযোগিতাভিত্তিক (সোসাল ইউটিলিটারিয়ান)—এই দু'ভাগে ভাগ করা চলে। সে যুক্তিগুলি এই :

তাত্ত্বিক যুক্তি

১. যেহেতু চার থেকে দশ বছরের শিশুরাই ভাষা শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি পারঙ্গম এবং দশের বেশি বয়সে ভাষা শিক্ষার সহজাত পটুত্ব হ্রাস পেতে থাকে সেহেতু ঐ সময়েই শিশুকে স্কুলে L2 (ইংরেজি) শেখানো শুরু করা উচিত।

২. আর একটি যুক্তি সেদিন শুনে তাজ্জব হলাম। এক বক্তা—তিনি নাকি কোন্ কলেজের প্রিন্সিপাল—বলছিলেন, আমাদের বাড়ির কাজের লোকেরা এবং অশিক্ষিত মানুষেরাও যেহেতু কথায় কথায় "টাইম', 'ট্রেন' 'স্ট্রাইক', 'লাইন' এইসব ইংরেজি কথা ব্যবহার করে, সুতরাং ইংরেজি শিখলে আমাদের সুবিধে হবে। এ যে কোনো সুস্থমস্তিষ্কের লোক বলতে পারে তা

কল্পনা করা দুঃসাধ্য—তবু দু'নম্বর তাত্ত্বিক যুক্তি হিসেবে এটিকে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না, তা পণ্ডশ্রম হবে মাত্র।

সামাজিক উপযোগিতাভিত্তিক যুক্তি

১. ইংরেজি বিশ্বভাষা এবং 'বিশ্বের জানালা' ; সুতরাং ইংরেজি শিখতে হবে।

২. ইংরেজিতে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আশ্রিত, সুতরাং তা শেখা দরকার।

৩. ইংরেজি না শিখলে আমরা 'মানুষ হতে পারব না'।

৪. ইংরেজি না শিখলে বাংলাও ভাল করে শেখা হবে না।

৫. ইংরেজি উচ্চশিক্ষার ভাষা, সুতরাং ইংরেজি না শিখে আমাদের উপায় নেই।

৬. ইংরেজি ব্যবসায়-বাণিজ্য, উচ্চাঙ্গের পেশা ও অফিস-আদালতের ভাষা, সুতরাং ইংরেজি না শিখলে ভালো চাকরি পাওয়া অসম্ভব হবে।

৭ সর্বভারতীয় পরীক্ষা বেশির ভাগই বা সবই হয় ইংরেজিতে। সুতরাং ইংরাজী না শিখলে সর্বভারতীয় চাকরি পাওয়া যাবে না।

৮. কিছু লোক ইংরেজি মিডিয়াম ইস্কুলগুলিতে ইংরেজি শিখবে একবারে গোড়া থেকে, আর অধিকাংশ মানুষ বাংলা স্কুলে মোটে সাত বছর শিখবে—এতে ইংরেজি বেশি জানা এবং ইংরেজি কম-জানা লোকের দুটি স্পষ্ট শ্রেণী যে শুধু তৈরি হবে তাই নয়, যারা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে বা তার আগেই, স্কুল ছেড়ে দেবে—পশ্চিমবাংলার গ্রামে অধিকাংশ শিশু যা করতে বাধ্য হয়—তারা আদৌ ইংরেজি জানবে না। ফলে দেশে অজস্র ইংরেজি না জানা এবং অনেক ইংরেজিতে চৌকস মানুষের উদ্ভব হবে। এতে সামাজিক সম্পদের অসম বণ্টন হবে। কারণ ইংরেজি জানারাই সমাজের অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখল করবে—কারণ সমাজে তারাই নেতৃস্থানীয়, শক্তি ও সম্পদ তাদেরই হাতে। ইংরেজি না-জানা মানুষেরা বঞ্চিত হতে থাকবে।

২. প্রাথমিক স্তরে ইংরেজির পটভূমিকা—ভারত ও বিশ্ব

উপরে নথিভুক্ত যুক্তিগুলির বিচার-বিবেচনা করবার আগে ভারতবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার পটভূমিকাটি যেমন দেখা দরকার, তেমনি সারা পৃথিবীতে শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির ভূমিকা কী—তাও একটু পর্যালোচনা করা উচিত। তা না করলে ভারতবর্ষে ইংরেজি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ

এবং এখনও এই ভাষার গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা হবে না।

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের বাহন কোন্ ভাষা হবে এই নিয়ে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ দশকের ইংরেজ শাসকরা প্রাচ্যবাদী (ওরিয়েণ্টালিস্ট) এবং ইংরেজিপন্থী (অক্সিডেন্টালিষ্ট বা আংলিসিষ্ট) এই দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম দল চাইতেন প্রাচীন ও ধর্মীয় ভাষা (সংস্কৃত, আরবি) এবং ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করা হোক, আর দ্বিতীয় দলের আকাঙ্ক্ষা ছিল সরকারী ধনাগারের রাজস্ব ব্যয় হবে ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন শেখানোয়। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চের রেজোলিউশনে মেকলের সূত্র গৃহীত হওয়ায় ইংরেজিপন্থী মেকলে, বার্ড, সনডার্স, বুশবি, কলবিন, স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ান, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির জয় হল, প্রাচ্যবাদী হোরেস হেম্যান উইল্‌সন, এইচ. টি. প্রিন্সেপ, জেম্‌স্ প্রিনসেপ, সাদারল্যাণ্ড প্রভৃতিরা পরাস্ত হলেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে মেকলের যে একটু অবজ্ঞা ছিল তার তো ঐতিহাসিক রেকর্ডই আছে। তাই তিনি চাইলেন এমন একটি এলিট ভারতীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে যারা হবে "Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect." তিনি এমন উচ্চাশাও পোষণ করলেন যে তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ ও অনুসরণ করলে তিরিশ বছর পরে বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে আর একজনও মূর্তিপূজক খুঁজে পাওয়া যাবে না!—"...it our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable clases of Bengal 30 years hence," মেকলের এই 'মিনিট'-এর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, ইংরেজির মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষিত ঐ 'নয়া ব্রাহ্মণ'রা আবার তাদের নিজেদের ভাষায় বা ভার্নাকুলারে দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষার আলোক দেখাবে। এইভাবে ইউরোপের উচ্চ ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান উপর থেকে নিচে ছড়াবে—যার জন্য একে 'ডাইনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিয়োরি' বলা হয়েছে। এই তত্ত্বের ভালোমন্দ এখানে আমাদের বিচার্য নয়। ঘটনা এই দাঁড়াল যে, ১৮৪০-এর কাছাকাছি থেকেই শুধু অফিস আদালত নয়, শিক্ষার ভাষাও হয়ে গেল ইংরেজি। তবে সকলের জন্য যে এ শিক্ষা নয়, নির্বাচিত

কয়েকজনের জন্য— মেকলে এ একথাও বলেছিলেন। এতেই স্পষ্ট যে এ শিক্ষা জনশিক্ষা নয়—দেশের সমস্ত মানুষকে লেখাপড়া শেখানোর কথা মেকলে আদৌ ভাবেননি। ফলে 'ভার্নাকুলার'-এর পরোক্ষ উপযোগিতার দিকে ইঙ্গিত করা হল, কিন্তু তার কোনো স্পষ্ট ভূমিকা তখনও নির্দেশ করা হল না। ১৮৩৫-এ উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে ইংরেজির মধ্যস্থতায় ভারতীয়দের লেখাপড়া শেখানোর প্রকল্পকে বাতুলতা আখ্যা দিলেন। ১৮৪৩-এর পরে তখনকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (এখানকার উত্তর প্রদেশ) লেফটেনান্ট গভর্নর জেম্স টমাসন মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে খবর পাই। তবে ১৮৫৪-তে প্রচারিত সার চার্লস উড-এর 'ডেসপ্যাচ'-এই প্রথম পরিষ্কার করে বলা হল যে, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এই ডেসপ্যাচের মূল কথাটি ছিল "English for the selected few and Vernacular for the masses" ১৮৮২-৮৩-র হানটার কমিশনও এই একই রায় দিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের জন্য, তার বাহন হবে মাতৃভাষা। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি করে জোর দেওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার পিছনে খরচ ও মনোযোগ যতটা বেড়ে উঠল, প্রাথমিক শিক্ষা সে তুলনায় বেশ অবহেলিতই হতে লাগল। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠল লর্ড কার্জন যাকে বলেছিলেন 'উল্টানো পিরামিড'—এক আশ্চর্য মাথাভারী তন্ত্র। দেশের অধিকাংশ মানুষ (১৯৭১-এর হিসাবে শতকরা প্রায় ৬৭ জন) রইল নিরক্ষর, অথচ গড়ে উঠতে লাগল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এর কুফল ধরা পড়তে যে খুব দেরি হল তা নয়। ১৮০৩ সালে পাদ্রি ওয়ার্ড বাংলার প্রায় সব গ্রামেই টোল বা পাঠশালা বা পুরাণো ভারতীয় প্রথার স্কুল যে আছে তা লক্ষ করেছিলেন। উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫-এ ১,৫০,৭৪৮টি গ্রামে অন্তত এক লক্ষ স্কুল দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০৪-এর ১১ মার্চ তারিখের Government Resolution-এ এই আক্ষেপ দেখি যে, "4 villages out of 5 are without school; 3 boys out of 4 grow up without education and only one girl in 40 attends any kind of school.[৩] এ পর্যন্ত যারা ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া এবং ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি শিখে এসেছে তাদের অবস্থাও তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ১৯০২-এর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মতে ইংরেজিতে লেখাপড়া শিখেও ভারতীয় ছাত্ররা "after Matriculation fail

to understand lectures in English when they join the college.[8] ফলে ১৯০৪-এ একটি সরকারি রেজলুশনে ১৩ বছরের কম বয়েসী ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ার শর্ত তুলে নেওয়া হল। ১৮৮২-তেই ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হানটার কমিশন) এটা লক্ষ করেছিলেন যে, তখনকার শ্রেষ্ঠ স্কুল হিন্দু স্কুলে ভর্তির পরীক্ষায় যারা বসত তাদের মধ্যে "a steady majority of successful competitors came from the vernacular and not from the English Middle school."[৫]

মাতৃভাষায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ১৯০২-এ নিযুক্ত শিক্ষা কমিশন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৯৩০ নাগাদ দেশের অনেক স্কুলেই ভারতীয় ভাষা শেখানো শুরু হয়ে যায়। তার অনেক আগেই অবশ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ-এ বাংলায় শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। ১৯০৬-এর ১১ মার্চ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইংরেজি বক্তৃতাতেই বলে দিয়েছিলেন .. "Vernaculars (are) to be the medium of instruction."[৬] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তরদানের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৪০ থেকে। কিন্তু বিহারে ১৯২৫ থেকেই উঁচু ক্লাসে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উদ্‌যোগ শুরু হয়, আর বোম্বাই প্রদেশে ১৯২২-এ স্কুলের অন্ত্য-পরীক্ষায় মাতৃভাষায় উত্তরদানের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। পাঞ্জাবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯২৪-এ[৭]। একজন বিদেশী গবেষক মাতৃভাষার এই সাফল্যের পিছনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী প্রভৃতির প্রয়াসের গুরুত্ব লক্ষ করেছেন[৮]।

প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষার অন্তর্ভুক্তি কবে থেকে হয় তার হদিশ আমি পাই নি, এবং তা এ প্রবন্ধের পক্ষে তেমন জরুরিও নয়। তবে ১৯০৬-এ প্রতিষ্ঠিত ঐ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাথমিক বিভাগের সিলেবাস দেখি, তার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ বছরে "English Alphabetical Primer" পাঠ্য করা হয়েছে এর 'Literary' অংশে[৯]। কিন্তু 'জাতীয়-শিক্ষা'র সিলেবাস আর সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শিক্ষার সিলেবাস এক হওয়ার কথা নয়। যতদূর মনে হয়, ১৮৪৪-এ সরকারি চাকরিতে ইংরেজি জ্ঞানকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ফতোয়া জারির ফলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা আরো বেড়ে যায়। ফলে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ইংরেজি শিক্ষার সবচেয়ে প্রধান এবং সবচেয়ে ব্যাপক প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।

যাই হোক, স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়ানোই রীতি ছিল। উনিশ-শো পঞ্চাশের গোড়ার দিকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রাথমিকের প্রথম চার বছরে ইংরেজি শেখানো বর্জন করেন। অতঃপর পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানো শুরু হয়। ১৯৭০ সাল থেকে আবার তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চলছে। এই সূত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি প্রাথমিকের কোন শ্রেণী থেকে শুরু হচ্ছে তার একটা চিত্র দেওয়া হচ্ছে :

অন্ধ্র	III (L3) (সেখানে হিন্দী L
আসাম	IV (L2)
বিহার	প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো হয় না
গুজরাট	”
হরিয়ানা	”
জম্মু ও কাশ্মীর	”
কেরল	III (L2)
মধ্যপ্রদেশ	প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো হয় না
মহারাষ্ট্র	”
কর্ণাটক	”
নাগাল্যাণ্ড	I (L2)
ওড়িশা	প্রাথমিক স্তরে পড়ানো হয় না
পাঞ্জাব	”
রাজস্থান	”
তামিলনাড়ু	III (L2)
উত্তরপ্রদেশ	পড়ানো হয় না
পশ্চিমবঙ্গ	III (L2)
আন্দামান ও নিকোবর	তথ্য পাওয়া যায় নি
চণ্ডীগড়	পড়ানো হয় না
দাদরা, নগর হাবেলী	”
দিল্লী	”
গোয়া, দমন, দিউ	IV (L2)

হিমাচল প্রদেশ	IV (L2)
লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি	III (L2)
মণিপুর	III (L2)
নেফা	II (L3)
পণ্ডিচেরী	পড়ানো হয় না
ত্রিপুরা	III (L2)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী অনেক জায়গাতেই শেখানো হয়। তবে ব্যতিক্রমও কম নেই। একটি তালিকায় দেখছি এই সব দেশগুলিতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শেখানো হচ্ছে :

আফ্রিকা	বছর	প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিখতে থাকা ছাত্রের শতকরা হিসাব
বটসোয়ানা	১৯৭২	১০০.০
ক্যামেরুন	১৯৭১	৫৬.৮
ইথিয়োপিয়া	”	১৪.০
গাম্বিয়া	১৯৭২	১০০.০
ঘানা	১৯৭১	১০০.০
কেনিয়া	”	১০০.০
লেসোথো	”	১০০.০
লাইবেরিয়া	১৯৭০	১০০.০
মালোয়ি	”	১০০.০
মরিশানিয়া	১৯৭১	১৫.৯
মরিশাস	”	১০০.০
নাইজেরিয়া	”	১০০.০
দক্ষিণ আফ্রিকি রিপাবলিক	১৯৭০	১০০.০
রোডেশিয়া	১৯৬৮	১০০.০
সিয়েরা লেয়োন	১৯৭১	১০০.০
সোমালিয়া	”	৩৩.৬
সোয়াজিল্যাণ্ড	১৯৭২	১০০.০
তানজানিয়া	১৯৭১	১০০.০
উগাণ্ডা	১৯৭২	১০০.০
জাম্বিয়া	”	১০০.০

আফ্রিকার যে-সব দেশে প্রাথমিক স্তরে আদৌ ইংরেজি পড়ানো হয় না সেগুলি হল আলজিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, মধ্য আফ্রিকি প্রজাতন্ত্র, চাদ, মিশর, গাবন, গিনি, আইভরি কোস্ট, লিবিয়া, মাদাগাসকর, মালি, মরক্কো, নাইজার, সেনেগাল, সুদান, টোগো, টিউনিশিয়া, আপার ভোল্টা, জেয়ারে।

এশিয়া

বাংলাদেশ	১৯৬৯	৪৫.৫
হংকং	১৯৭১	৮০.৫
ভারত	"	১০.০
ইরাক	"	২৪.৭
ইজরায়েল	"	৫৬.০
জরডান	"	২৫.০
লেবানন	১৯৭০	৩৩.৩
মালয়েশিয়া	১৯৭১	১০০.০
নেপাল	১৯৬৯	৪৩.৮
ফিলিপিনস	১৯৭২	১০০.০
সিঙ্গাপুর	১৯৭১	১০০.০
শ্রীলঙ্কা	১৯৬৯	৪১.৩
তাইল্যাণ্ড	১৯৭০	২৫.০

এশিয়ার যে সব দেশে, প্রাথমিক স্তরে আদৌ ইংরেজি শেখানো হয় না সেগুলি হল আফগানিস্তান, বার্মা, সাইপ্রাস, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়ায়েত, লাওস, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ ভিয়েতনাম। তাইওয়ান সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় নি। চীন সম্বন্ধেও এঁরা খবর জানেন না।

ইয়োরোপ

অষ্ট্রিয়া	১৯৭১	২৭.৪
চেকোস্লোভাকিয়া	"	২৫.৮
ডেনমার্ক	"	৩৪.৫
ফিনল্যাণ্ড	"	৪২.১
পশ্চিম জার্মানি	"	১৫.৪
লুক্সেমবুর্গ	"	৭০.০

মালটা	১৯৭১	১০০.০
নরওয়ে	”	২৫.৯
রোমানিয়া	”	১০.৮
স্পেন	”	০.৪
সুইডেন	”	৫৯.৭
সুইজারল্যাণ্ড	”	২৪.২
সোবিয়েৎ রাশিয়া	”	১২.৫

ইয়োরোপে যেসব দেশে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি একেবারেই শেখানো হয় না সেগুলি হল: বেলজিয়াম, বালগেরিয়া, ফ্রান্স, পূব জার্মানি, গ্রীস, হাঙ্গারি, আইসল্যাণ্ড, ইতালি, নেদারল্যাণ্ডস, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, যুগোস্লাভিয়া।

দক্ষিণ (লাতিন) আমেরিকা (২.৬%)

কলোম্বিয়া	১৯৬৯	৯.৪
কিউবা	১৯৭১	২.৫
হণ্ডুরাস	১৯৭০	২.৬
মেক্সিকো	”	৩.৪
পুয়ের্টোরিকো	১৯৭১	১০০.০

যেসব দেশে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি নেই: আর্জেনটিনা, বলিভিয়া, ব্রেজিল, চিলি, কোস্টারিকা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াটেমালা, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা।

মনে রাখতে হবে, উপরের যেখানে ইংরেজি পাঠ্য সেখানে ইংরেজি সর্বত্রই যে শিক্ষার বাহন তা নয়, কখনও কখনও তা শিক্ষার অন্যতম বিষয়মাত্র। আমার সূত্র থেকে বাহন/বিষয় ভেদে মহাদেশগুলিতে ইংরেজির ভূমিকাটি এই ছকে এভাবে উপস্থিত করা চলে (কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে)—

	ইংরেজি ক্লাসে মোট ছাত্র	বিষয় ইংরেজি	%	বাহন ইংরেজী	%
আফ্রিকা	১৫,৪৩৮,২৫১	৭,৮১২,৮৭৫	৫০.৬	৭,৬২৫,৩৭৬	৪৯.৪
এশিয়া	২২,০৭৭,৫৫৩	১৫,৬৯৮,৫৮৫	৭১.০	৬.৩৭৮,৯৬৮	২৮.৯
ইয়োরোপ	৩,০৭৭,৪৪৭	৩,০৭৭,৪৪৭	১০০.০	—	—
লা. আমেরিকা	১,১১০,২৪২	১,১১০২৪২	১০০.০	—	—
সোবিয়েৎ রাশিয়া	৫,০০০,০০০	৫,০০০,০০০	১০০.০	—	—

যে প্রবন্ধটি থেকে উপরের তথ্যগুলি উদ্ধার করেছি তাতে ইংরেজি বিশ্বভাষা কেন হয়ে উঠল তারও কারণ নতুন করে যাচাই করার চেষ্টা আছে। ১৯৩৭-এ অটো ইয়েসপার্সেন বলেছিলেন, ইংরেজির এই অত্যাশ্চর্য বিস্তারের কারণ এই নয় যে, এ ভাষার ব্যাকরণ সরল বা ভাষাটি বিশেষ উন্নত ; কিংবা এও নয় যে, এ ভাষা যারা মাতৃভাষা হিসাবে বলে তাদের সাংস্কৃতিক মান অন্য ভাষাভাষীদের চেয়ে উচ্চদরের। ইংরেজির প্রসারের মূল কারণ ইংরেজি ভাষীদের অন্যদের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব (পলিটিক্যাল অ্যাসেনড্যান্সি)। অর্থাৎ অধীনস্থ প্রজারা মূলত নিজেদের স্বার্থে ইংরেজি শিখেছে। ট্রাউনমুল্যের (Traunmuller) নামে আরেকজন গবেষক সূত্রাকারে ইয়েসপার্সেনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন, বলেছেন, "a second language will be learned if and only if the presumptive learner estimates the advantages of knowing that language to be higher than the costs."[১১]

এই প্রবন্ধে ফিশম্যান ও কনরাড ট্রাউনমুল্যের-এর সূত্রটিকে একটু অতিরঞ্জিত বলেছেন তারা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভুত্বের দ্বারাই এখনও ইংরেজির প্রধান্যের অধিকাংশ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। এঁরা লক্ষ করেছেন,

১। এখনও সেই সব অন্যভাষী দেশে ইংরেজি সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় যে-সব দেশ হয় এককালে ইংরেজি ভাষীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্বীকার করেছে কিংবা এখনও করে চলেছে।

২। অন্যভাষী যে-সব রাষ্ট্রে এই প্রভুত্ব ছিল না বা নেই সেখানে ইংরেজিকে বাহন করে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত নেই বললেই হয়। যেখানে আছে, সেখানে ইংরেজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা সত্ত্বেও জাতীয় ভাষার (যেমন মালয়েশিয়াতে—মালয়, তানজানিয়াতে—সোয়াহিলি এবং ইথিওপিয়াতে—অ্যামহারিক ভাষার) উন্নয়ন ও প্রসার কালক্রমে ইংরেজির ভিত্তিকে দুর্বল করবে—এমনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

৩। ইংরেজি দেশগুলিতে ইংরেজির মধ্যে দিয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভের প্রবণতা দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

৪। যেসব দেশে ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সেগুলিও অধিকাংশত প্রাক্তন বা বর্তমান উপনিবেশ। এশিয়ার ইংরেজি সংবাদপত্রের ৯৭ শতাংশ এমন দেশগুলি থেকেই প্রকাশিত হয়।

৫। ইংরেজিতে গ্রন্থ প্রকাশ সবচেয়ে বেশি, সে মূলত আন্তর্জাতিক পাঠকগোষ্ঠীর কাছে বিক্রি ও প্রচারের কথা ভেবে।[১২]

৩. ভারতে ইংরাজির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা :

ভারত একটি ইংরাজিভাষী জাতির প্রাক্তন উপনিবেশ, কাজেই ভারতে ইংরেজির প্রসার এবং সমাদরের সবচেয়ে বড়ো কারণটাই উপস্থিত। ফিশম্যান এই গ্রন্থেরই আরেক জায়গায় খুব স্বচ্ছ বলেছেন, "Languages are rarely acquired for their own sake. They are acquired as keys to other things that are desired."[১৩]

মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের কাছে ইংরেজির সঙ্গে ভালো চাকরি, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদির সমীকরণ ঘটে যায়, বিশেষ করে ইংরেজি শিখলেই সরকারি ও অন্যান্য চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখেই দলে দলে মানুষ ইংরেজি শিখতে শুরু করে।

উচ্চশিক্ষা ও চাকরি—ইংরেজির সঙ্গে এ দুটির একটি সমীকরণও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়েও বাঙালি যুবকের কাছে ভালো চাকরির আশা যে ক্রমশ মরীচিকাবৎ হয়ে উঠছে—এ ঘটনা ১৮৯৮ সালেই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ শিক্ষা যেমন মৌলিক গবেষণা ও জ্ঞানচর্চারত শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে পারে নি, তেমনিই এ থেকে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। আর অর্থনৈতিক সুফল-প্রদানেও এ শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে বলে অধিকাংশ স্নাতক বা প্রাক্‌ স্নাতক ছাত্রের ধারণা। কারণ এই সব ছাত্রেরা "With a smattering of literary or semi-scientific instruction find it hard even to earn a bare pittance to keep body and soul togather."[১৪] Indian Unrest (লণ্ডন, ১৯১০) গ্রন্থের লেখক ভ্যালেণ্টাইন চিরল ক'বছর পরেই জানাচ্ছেন যে, যেখানে এ দেশে একজন দক্ষ কারিগর, এমন কি সাধারণ মজুর পর্যন্ত দৈনিক বারো আনা থেকে একটাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, সেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া যুবকের ভাগ্যে প্রায়ই মাসিক তিরিশ টাকা, এমন কী বিশ টাকা মাইনের চাকরিও জোটে না।[১৫] ১৯১০ সালে একজন ইংরেজই লিখছেন এ কথা। বঙ্গীয় রেনেশাঁসের মহিমায় আপ্লুত থাকার ফলে তার এদিককার বাস্তবের দিকে আমরা তেমন করে নজর দিইনি। কাজেই ইংরেজী শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেলেই ভালো চাকরি জুটবে, অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আর

সত্য রইল না। গত শতাব্দীর শেষে বা এ শতাব্দীর গোড়ায় যে সমস্যা সকলের চোখে পড়েছিল, এখন তার ব্যপকতা কমে এসেছে এমন বোধ হয় দাবি করা যাবে না।

এর মধ্যে ভারতবর্ষের একাধিক ভাষা (ইংরেজদের ঐ 'ভার্নাকুলার') যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং উচ্চশিক্ষার কোনো কোনো অংশে ইংরেজিকে স্থানচ্যুত করেছে। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন, উচ্চতম গণিত ও বিজ্ঞানে ইংরেজির মধ্য দিয়েই উচ্চশিক্ষা নিতে হয়। ভারতবর্ষে ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের, অফিস ব্যাঙ্ক ইত্যাদির ভাষা এখনও অধিকাংশত ইংরেজী, আর ইংরেজী এখনও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। স্বাধীনতার পরে ইংরেজীর 'স্ট্যাটাস সিম্বল' লক্ষণটি আরও বেড়েছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পুত্রকন্যাকে ভর্তি করানোর জন্য এখন মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাপ-মা রাত জেগে লাইন দিয়ে ফর্ম জোগাড় করেন। অর্থাৎ ইংরেজির বাস্তব ও মানসিক বা কল্পিত গুরুত্ব যে এখনও যে-কোন ভারতীয় ভাষার চেয়ে অনেক ভারতীয়ের কাছেই বেশি—একথা অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই, ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ এতটুকু কমে নি, আর L2 হিসাবে তার প্রয়োজনও ফুরায় নি। তবে আমাদের আদি প্রশ্ন, অর্থাৎ ঐ বাস্তব ও কল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে প্রাথমিক স্তরের ক্লাস ওয়ান থেকেই ইংরেজি শিক্ষা অবশ্য-কর্তব্য কিনা—ইংরেজির জন্য এই ব্যগ্রতার মধ্যে তার উত্তর নেই। ভারতবর্ষে এখনকার অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকের জন্য ইংরেজি দরকার—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলকে চার বছর বয়স থেকেই ইংরেজী শিখতে হবে—এই দাবির তাতে প্রতিষ্ঠা হয় না।

৪. ইংরেজিপন্থীদের যুক্তির বিচার

ফলে যে-সব তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপযোগিতা-নির্ভর দাবি করা হয়েছে সেগুলির বিচারে ফিরে আসতে হয়। তা করতে গিয়ে আমরা সামাজিক বা অন্যান্য উপযোগিতাভিত্তিক যুক্তিগুলির বিচার আগে করছি, পরে এঁদের একমাত্র তাত্ত্বিক যুক্তিটির আলোচনা করব।

সামাজিক-উপযোগিতা নির্ভর যুক্তি: ইংরেজি বিশ্বভাষা এবং 'বিশ্বের জানলা'। সুতরাং ইংরেজি শিখতে হবে।

এ যুক্তির প্রথম অংশের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, সত্যি ইংরেজি বিশ্বভাষা। আর ইংরেজি নানা কারণে কাউকে-কাউকে শিখতে হবে তাতেও সংশয় করি না। কিন্তু তার জন্য ক্লাস ওয়ান থেকেই কেন শিখতে হবে

ইংরেজি? এমন দৃষ্টান্ত এদেশেই প্রচুর আছে যে, ক্লাস ওয়ান থেকে, এমন কী ইংলিশ মিডিয়ামে ইংরেজি শিখেও বহু ছাত্র আদৌ শিখছে না ঐ ভাষা, আবার বেশি বয়সেও শিখে অল্পদিনেই ও ভাষায় পারঙ্গম হয়ে উঠছে। সুতরাং ইংরেজি বিশ্বভাষা এই দাবি ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শেখার অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠা করেনা, ইংরেজি শেখার প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠা করে।

ইংরেজিতে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য—পৃথিবীর প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য আশ্রিত, তা শেখা দরকার॥

আমরা এ রকম বুঝি না যে, শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যই আমরা পড়ব, তার চেয়ে সামান্যতম গৌণ, 'কষ্ট' অন্য সাহিত্য আমরা পড়ব না। যদি পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়াটাই উদারপন্থী শিক্ষার দিক থেকে কাম্য হয়—তাহলে সকলের ভাষা শিখতে হবে আমাদের? বা শুধু ইংরেজি সাহিত্যই 'অরিজিন্যাল' পড়তে সকলে বাধ্য—অন্য সব সাহিত্য—ফরাসি, জার্মান, রুশীয়, ইতালীয়, জাপানি, গ্রীক, স্প্যানিশ ইত্যাদি—অনুবাদে পড়লেই চলবে? ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান, ইতালীয়, জাপানি ইত্যাদিরা যে অনুবাদ করে সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়ে, এমন কী ইংরেজিরও—তাতে ইংরেজির অপমান হয়?

আর ইংরেজি সাহিত্যই পড়বে আপামর ভারতবাসী, তার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকশ্রেণী তৈরি করবার দরকার নেই? সকলকেই পড়তে হবে ইংরেজিতে ইংরেজি সাহিত্য। তর্কের জন্য যদি এ দাবি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও এই তত্ত্ব কী করে দাঁড় করানো যায়, কেবল ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শিখলেই ইংরেজি সাহিত্য পড়া সম্ভব হবে, নইলে হবে না? যারা ইংরেজি সাহিত্য বিশেষভাবে ঐ ভাষায় পাঠ করতে চায় তারা ইংরেজি নিশ্চয়ই শিখবে। কিন্তু সকলকেই কি এভাবে ইংরেজি সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করে তোলা সম্ভব হবে? ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শিখিয়েই?

ইংরেজি না শিখলে আমরা 'মানুষ' হতে পারব না।

এই যুক্তিটি আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। ভারতবর্ষের সত্তর কোটি লোকের মধ্যে সাতষট্টি কোটিই ইংরেজি জানে না। তারা কোনো অর্থে 'অমানুষ'—এমন ইঙ্গিত যদি কেউ করেন, তাতে তথাকথিত শিক্ষিতের মূর্খ অহমিকা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায় না। আর ইংরেজি শিখেই আমরা কতজন কি অর্থে 'মানুষ' হয়েছি? চাকরি-বাকরি-কোট-টাই-ফ্ল্যাট-ফ্রিজ দিয়েই মনুষ্যত্ব? এমন যুক্তির সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়াও মূঢ়তা।

ইংরেজী না শিখলে বাংলাও ভালো শেখা হবে না।

ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বাংলা ভাষার এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, তাতে আমি এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য মনে করি। এই মুহূর্তে বাংলা ভাষা নিজেই এমন স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ যে, তা শিখতে গেলে অন্য কোনো ভাষা শেখার দরকার নেই। তার মানে এই নয় যে, ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক (contact) বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটায় নি। অবশ্যই ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে আরো ঘটাতে পারে, এমন সম্ভাবনাও আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভাষার সঙ্গে ভাষার আলাপ-পরিচয় আদান-প্রদানের সম্পর্ক উপর মহলেই সাধারণত বেশি ঘটে। ইংলণ্ডে নর্মান বিজয়ের পর উচ্চ অভিজাত সমাজে ফরাসি সংস্কৃতির প্রসার হওয়ার সূত্রে যেমন হাজার হাজার ফরাসি ও ল্যাটিন শব্দ ইংরেজিতে ঢুকে পড়ে, ফলে সে ভাষা দ্বীপবদ্ধ গ্রাম্য ভাষা থেকে সংস্কৃতিবানের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এই contact বজায় রাখার জন্য সমস্ত বাঙালির ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শিখতে হবে—এ দাবি যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়।

ইংরেজি উচ্চশিক্ষার ভাষা।

সে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু অনন্তকাল ধরে ভারতবর্ষে ইংরেজি উচ্চশিক্ষার ভাষা থাকবে কিনা সন্দেহ মালয়েশিয়া, বার্মা, তানজানিয়া, ইথিয়োপিয়া ইত্যাদি দেশে আমাদের ভারতবর্ষের মতোই একটি স্থানীয় ভাষা ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে উচ্চশিক্ষায় ইংরেজির সর্বাঙ্গীণ অধিকার ক্রমশ সংকুচিত করে আনছে। ভারতবর্ষেও এই জিনিসটি আজ হোক কাল হোক ঘটতে বাধ্য। তখন হয়তো সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য কেবল ইংরেজি, জার্মান বা রুশ ভাষা (বা অন্য কোনো 'উন্নত' ভাষা) 'রীডিং নলেজ' বা পড়তে পারার মতো জ্ঞানই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এখন আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এম. এ. বা পি-এইচ. ডি করতে গেলে ইংরেজি ছাড়া আর একটা বা দুটো উচ্চাবস্থার ভাষা ('স্কলারলি ল্যাঙ্গুয়েজ') পড়তে পারার পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। কিন্তু তর্কের মূল প্রশ্ন হল যদি কাউকে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা নিতে হয়ই (ধরা যাক এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, এবং মাতৃভাষার সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা)—তবে তার প্রাইমারির ক্লাস ওয়ান থেকেই ইংরেজী শিখতে হবে কি না? শিখতে হবে, এই দাবিকে কেউ যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে এ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন নি, তা করাও খুব সহজ নয়। এই লেখক

ব্যক্তিগতভাবে জেনেছে যে, জাপানের কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দু-বছর জাপানি ভাষা শিখিয়ে বিদেশি ছাত্রদের জাপানি ছাত্রদের সঙ্গেই সেখানকার উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তারা কোনো অসুবিধা বোধ করে না। জাপানের ভাষা শেখানোর পদ্ধতি নিঃসন্দেহে খুবই উন্নত, কিন্তু তারা যেটা দুবছরে পারছে আমরা সেটা সাত বছরে কেন পারব না তা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সোভিয়েৎ ভূখণ্ডেও প্যাট্রিস লুমুম্বা বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের দুই থেকে তিন বছর রুশ ভাষা শিখিয়ে নিয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় বলে শুনেছি—ভারতবর্ষে এরকম উচ্চশিক্ষা পাওয়া প্রচুর ছাত্র ফিরে এসে মূল্যবান কাজ করে চলেছেন। প্রাইমারির প্রথম ক্লাস থেকে তাঁদের রুশভাষা শেখার কোন প্রয়োজন হয়নি। উচ্চশিক্ষার চৌকাট পর্যন্ত যাঁরা যাবেন তার অনেক আগে থেকেই তাঁরা ইংরেজী ভাষাটি ব্যবহার করতে শুরু করবেন।

এ ব্যবস্থাও অসংগত সন্দেহ নেই। পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত দেশে ব্যবহারিক প্রয়োজনে সেকেণ্ডারি স্তর পর্যন্ত ইংরেজি শেখানো হলেও উচ্চশিক্ষা সেই সেই দেশের ভাষাতেই দেওয়া হয়,--উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত। কমিউনিস্ট দেশের কথা ইচ্ছে করেই বলছি না, কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন বা জাপানে ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, এম. এ. পি-এইচ ডি হচ্ছে কোনো বিদেশী ভাষার বই পড়ে ক্লাস লেকচার শুনে পরীক্ষার খাতায় উত্তর বা থিসিস লিখে—এ দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না। মানি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অবস্থা একটু ভিন্ন, কিন্তু তারই জন্য ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা-গুলি কোনদিন উচ্চতম শিক্ষার বাহন হতে পারবে না—এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দীর্ঘকাল পরাধীনের মানসিক দাসত্বের চিহ্ন বড়ো বেশি প্রকট। আর এখানকার মতো ইংরেজি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ভাষা বলেই একেবারে পাঠশালার প্রথম শ্রেণী থেকে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ক্লাস পর্যন্ত শিখে যেতে হবে—এ দাবির মধ্যে একটা বিস্ময়কর জুলুম ছাড়া আর কিছু নেই। আমার কাছে যা তথ্য আছে তাতে পৃথিবীর আর কোন দেশে দ্বিতীয় ভাষার এমন প্রভুত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। এমন-কী যেসব দেশগুলিকে Angophone দেশ বলা যায়—ইংরেজের প্রাক্তন উপনিবেশ—সেখানেও না।

ভালো চাকরি পাবার উপায় ইংরেজি।

কথাটা এখন কতটা সত্য? আগেই বা কতটা সত্য ছিল? সত্যি ইংরেজি শিখলেই ভালো চাকরি জোটে? তাহলে দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত

বেকারের এই নিদারুণ দৃশ্য কেন? এমন বলা হতে পারে যে, যারা ভালো করে ইংরেজি শেখে। অর্থাৎ যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে-টুলে পড়ে ইংরেজি শেখে ভাল চাকরী পায়। এ কথাটার মধ্যে আংশিক সত্যতা থাকতে পারে, যদিও পরিসংখ্যান আমি জানি না। হ্যাঁ, এমন দেখা গেছে যে নেসফিলডের ব্যাকরণ বা অক্সফোর্ডের কনসাইজ অভিধান যাঁর মুখস্থ এমন মানুষ সারা জীবন গ্রামের স্কুলে হতদরিদ্র শিক্ষাকতায় ভারাক্রান্ত ও অবহেলিত জীবন কাটিয়ে গেলেন। অন্যদিকে তাঁর চেয়ে কম ইংরেজি জেনে, কিন্তু সহজে ইংরেজি বাচন পদ্ধতি জেনে, স্যুট পরে টাই বেঁধে, বিরাট চাকরী বাগিয়ে বসল। এটা ইংরেজি 'জানা'র তারতম্যের জন্য ঘটছে না, ঘটছে বিশেষ পদ্ধতিতে ইংরেজী শেখার জন্য। 'জ্ঞানের' সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এখন তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি শিশুকে ঐভাবে ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে—ঐ ইংলিশ মিডিয়ামে? ধরে নেব প্রত্যেকেই উঁচু চাকরি করবে, প্রত্যেককেই ইনটারভ্যুতে চটপট সপ্রতিভ ইংরেজি বলে উৎরে যেতে হবে। এই অবিশ্বাস্য দাবিটাই তাহলে উঠুক না কেন? কারণ এ তো দেখাই যাচ্ছে যে ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়লেও, পনেরো বছর ধরে ইংরেজি পড়লেও, চাকরি পাবার কোন সুরাহা হয় না—দেশের শিক্ষিত বেকারেরা সে কথা হলফ করে বলবার জন্য এগিয়ে আসবেন। সমস্যাটা তাহলে এখানে নয় যে, কে ক্লাস ওয়ান থেকে, কে থ্রি থেকে বা কে সিক্স থেকে ইংরেজি শিখছে। সমস্যাটা শিক্ষার কতকগুলি লক্ষণের। কতটা শিখছে সেটা বড় নয়, কী কারণে শিখছে সেটাই বড়ো। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এখন যেভাবে ইংরেজি শেখানো হয়, গত দেড়শো-পৌনে দুশো বছর ধরে ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণত যে গ্রামের ট্রানস্লেশন মেথডে, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়হীন শিক্ষকদের দ্বারা, যেভাবে ইংরেজি শিখে এসেছে তাতে ক্লাস ওয়ান কেন, জননীগর্ভ থেকে ইংরেজি শেখানো শুরু হলেও চাকরী বা ইনটারভ্যুর কোনো সুরাহা হবে না। অন্যদিকে সঠিক পদ্ধতিতে দু-তিন বছরের মধ্যেই তাকে চাকরির জন্য তৈরি করে দেওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি। তাতে তার 'মানুষ' হওয়ার দিকে কতটা অগ্রগতি হবে, তা জানি না।

সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা—ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শেখা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্যের গ্যারানটি নয় যেমন, তেমনই ক্লাস সিক্স থেকে শিখে দশ বছর পড়ার পর (ধরে নিচ্ছে স্নাতক ক্লাসেও সর্বভারতীয়

পরীক্ষার কথা মনে রেখে ছাত্র ইংরেজিই পড়বে, বাংলা পড়বে না। ঐ পরীক্ষায় তার ব্যর্থতা অনিবার্য—এই দাবিও ধোপে টিকবে না। আর এ প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে, কজন যাবে সর্বভারতীয় পরীক্ষায়—দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় তারা কত শতাংশ? তাদের কথা ভেবে গোটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিন্যাস করতে হবে? এরই নাম কি দেশের need based education—যার ধুয়ো আজকাল সবাই তোলেন?

শ্রেণীভেদ তীব্র হবে।

সামাজিক উপযোগিতাভিত্তিক যুক্তিগুলির মধ্যে এই যুক্তিটিকেই বিশেষ তীব্রতা ও জোরের সঙ্গে প্রচারিত হতে দেখি। অনেকে দাবি করেন, যেন ঐ শ্রেণীভেদ এতকাল ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবাংলায় ছিলনা, এই ব্যবস্থার ফলে, অর্থাৎ ক্লাস সিক্‌স থেকে ইংরেজি শেখানোয় সৃষ্টি হতে যাচ্ছে!

যদি একটি শ্রেণীর অসংগত প্রভুত্ব ও সুবিধাভোগের কথাই উল্লেখ করতে হয়, সেটি কোন্ শ্রেণী? তা কি ইংরেজি শিক্ষিতের শ্রেণী? ক্লাস ওয়ান থেকে বাংলা স্কুলে ইংরেজী শেখার দল, না ইংলিশ মিডিয়ামের দল? না কি ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা? (এদের কথা তুলছি—এই যুক্তির হাস্যকরতা দেখানোর জন্য) শিক্ষিত বেকাররা এদের কোন দলে পড়ে? আমার মনে হয় এই রকম একটি সার্ভে করা গেলে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে, ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রভুত্ব ও সুবিধা ভোগের ছবিটিও কতটা সত্য তা প্রমাণ করা যাবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরণের সার্ভে করে দেখতে পারেন। এতে নিচের এলাকাগুলিতে ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা ও মান খুঁজে বার করতে হবে—

(১) দেশে প্রাইভেট কারের মালিকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা ও শিক্ষার মান। (২) দেশের ব্যবসায়ী, উদ্যোগী (আঁত্রেপ্রেন্যুর), কারখানার মালিক, বাড়ি, জমিজমা, মাছের ভেড়ি, চা-বাগান, কয়লা-খনি, ফলের বাগান, কোল্ড স্টোরেজ, যাত্রী-বাস, মিনিবাস, ট্যাকসি ইত্যাদির মালিকদেরও মধ্যে ঐ সংখ্যা ও মান। (৩) দেশের উচ্চ উপার্জনশীলদের মধ্যে ঐ সংখ্যা ও মান। (৪) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রী ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে ঐ সংখ্যা ও মান। (৫) ফ্রিজ, টেলিভিশন, ইত্যাদির মালিকদের মধ্যে ঐ সংখ্যা এবং মান। এই সার্ভে করার পর ইংরেজি শিক্ষিতের নেতৃত্ব ও সুবিধাভোগ সম্বন্ধে অনেক অলীক ধারণার সংস্কার করতে হবে, সন্দেহ নেই। আসলে শিক্ষা ও

রাজনীতির খুব স্পষ্ট জগতে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব আর সমাজের নেতৃত্ব এক কথা নয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বও বুর্জোয়া ব্যবস্থায় কেবল প্রকাশ্যভাবেই বুদ্ধিজীবীদের হাতে থাকে—আড়ালে থাকে অন্যদের হাত, তা আমরা জানি। আমাদের চাকরি-সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসে বড়ো চাকুরিয়াদেরই সমাজের নেতা বলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককে রাজা বলে মনে করে। সমাজের নেতৃত্ব চাকুরিয়াদের হাতে নেই, আছে মালিকদের হাতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সত্যটির দিকে অন্তত একজন সমাজ-মনস্ক ঐতিহাসিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

"উনিশ শতকে এবং স্বাধীনতা পূর্ব বিশ শতকে নগর নির্ভর, ইংরেজি ভাষী, পাশ্চাত্য শিক্ষানির্ভর ও পশ্চিমমুখী যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, তার উপজীব্য ছিল নানাবিধ সরকারী চাকুরী, শিক্ষকতা, আইন-ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিদ্যানির্ভর বৃত্তি, কৃষক-শ্রমিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন। এই সত্যোক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল [কেন? তখনও কিন্তু ইংরেজি 'মিডিয়ামেই' সেকেণ্ডারি স্কুলে নানা বিষয় পড়ানো হচ্ছে—প. স.] ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই শ্রেণীর শ্রেণীনেতৃত্বে ফাটল দেখা দিতে শুরু হয়েছিল। বিগত প্রায় দশ বার বছরের ভেতর এই সদ্য কথিত মধ্যবিত্তের শ্রেণী-নেতৃত্বের চেহারা ও চরিত্রে বেশ একটু পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। একান্তভাবে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৃত্তিনির্ভর যে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী, তাঁদের সামাজিক আধিপত্য ও নেতৃত্বের বেগ ও প্রতিপত্তি কমে আসছে; বস্তুত এই সংস্কৃতির যারা প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ ক্রমশঃ সরে যাচ্ছেন নেতৃত্বের সংগ্রামক্ষেত্র থেকে, নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় ও অন্বেষণে। একাধিক কারণে ইতিহাসের এই ঋতুবদলের সময় সামাজিক নেতৃত্ব আর তাদের কাছে লোভনীয় মনে হচ্ছে না [আমাদের প্রশ্ন, যদি 'লোভনীয়' মনেও হত, তাহলেও কি তারা ঐ নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারতেন?—প. স.]। তাদের জায়গা নিচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে যাদের কথা বলেছি সেই কুলাক সম্প্রদায় জোতদার গোষ্ঠী ও বর্ধিষ্ণু কৃষক সম্প্রদায়, এবং অন্যদিকে মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষুদে নায়কেরা!"

একটু পরে এই ঐতিহাসিক এই নতুন সমাজনেতাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট করেই বলেছেন "এঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে থাকলেও সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে এরা

পশ্চিমমুখী নয়। হয়ত একান্তভাবে ইংরেজী ভাষা নির্ভরও নন।" বামফ্রন্টের ইংরেজি ভাষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমাজের এই নেতৃ-পরিবর্তনের জন্য দায়ী—এমন কথা কোন ঐতিহাসিকই বলতে পারেন না। কিংবা ঐ সিদ্ধান্ত অবস্থার বড় রকমের হেরফের ঘটাবে, তাও বলা কঠিন। সে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন।

কাজেই ঐ নেতৃত্ব ও সুবিধাভোগের যুক্তিটিও পরিচ্ছন্ন যুক্তি নয়। শেষ পর্যন্ত যদি কেউ পুরোনো Link Language-এর কথা তোলেন, বলেন যে, ভারতবর্ষের ঐ Link Language হিসাবে শুধু ইংরেজিকেই রাখতে হবে, তার উত্তর দেওয়া পণ্ডশ্রম মনে করি। বহুভাষী দেশে যোগাযোগের একটা সাধারণ ভাষা থাকা দরকার, আর তার ভূমিকা খুবই সীমাবদ্ধ। যদি জেদ করে ইংরেজিকে রাখতেও হয় ঐ ব্যবহারের জন্য, ক্লাস ওয়ান থেকে তা শেখানোর দাবির সমর্থন তাতে গড়ে ওঠে না।

তাত্ত্বিক যুক্তি : শৈশবে ভাষা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ

মনোভাষাতত্ত্ব বা Psycholinguistics-এর দিক থেকে একটি যুক্তির অবতারণা করেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, স্টেটসম্যান পত্রিকায় এবছর মার্চ মাসের গোড়ায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মার্চের মাঝামাঝি তিন কিস্তিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নীহাররঞ্জন রায়ও এই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন। এঁদের মূল কথা হল, যেহেতু চার থেকে দশ বছর বয়সের অর্থাৎ প্রাগ্-বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুরা যে কোনো ভাষা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে, সেহেতু এই সময়েই এদের ইংরেজি শিখিয়ে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ প্রাইমারির প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ধরানো উচিত পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের শিশুদের। ভারতবর্ষের নানা শিক্ষা কমিশন যে এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছে তা এঁদের দ্বিধাগ্রস্ত করে নি, বরং এঁদের কণ্ঠস্বরকে আরো শক্তিশালী করেছে। সুনন্দবাবু কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ওয়াইল্ডার পেনফিলের মত উদ্ধার করেছেন, "The time to begin what might be called a general schooling in secondary languages in accordance with the demands of brain Physiology is between the 4 and 10...For all know this might be carried out with one language in the morning and the other in the afternoon since in any case the entrance into the morning class would be conditioned reflex that started the child in the one language while the entrance into the afternoon class might be a continuing reflex for starting him into the second language.[১৮]

এ কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই—যদি দেশটা হয় আমেরিকা, ক্যানাডা, বা সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব হুবহু খাটাতে গেলে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে তা সুনন্দবাবুর মতো তাত্ত্বিকরা সম্ভবত ভেবে দেখেন নি। আমার জ্ঞানবিশ্বাস অনুযায়ী আমি তাঁদের যুক্তির মারাত্মক ফাঁকগুলি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

চার থেকে দশের ঐ জাদু ফর্মুলা নিশ্চয়ই কার্যকর—যে শিশুদের ভাষা শেখার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে আমরা গত কয়েক হাজার বছর ধরেই জানি। কিন্তু ঐ ফর্মুলা সম্পূর্ণ কার্যকর সেখানেই—যেখানে সে ভাষাটা শিখছে মুখে, কথা বলে বলে। স্কুলের বাইরে কোনোরকমের চাপ ছাড়াই সে মুখে তুলে নিচ্ছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা—যদি তা ব্যবহার করার এবং শোনার সুযোগ থাকে তার। আর স্কুলে ঐ ভাষার তত্ত্বে ও ব্যবহারে অতি স্বচ্ছন্দ শিক্ষক ক্লাসে তথাকথিত উক্তি-শ্রুতি (Audio-Oral) কিংবা প্রত্যক্ষ (Direct) পদ্ধতিতে যদি তাকে শেখান, যদি তার প্রচুর বাক্য ও সংগঠন প্র্যাকটিস করার সুযোগ থাকে। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এভাবে পড়ানো হয় ইংরেজি? আমাদের স্কুলগুলোতে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার নাম যে ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি (Grammar and Translation Method) তা আগেই বলেছি। এই পদ্ধতিতে শিশু ভাষাটা বলতে প্রায় কিছুই শেখে না—তাকে বলতে উৎসাহও দেওয়া হয় না। তাকে শেখানো হয় পড়তে আর লিখতে। প্রথমেই এ-বি-সি-ডি দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে, পড়তে আর লিখতে শেখে। প্রাথমিক স্তরের শেষ দিকেই সে ব্যাকরণের প্রাথমিক সংজ্ঞাগুলি শিখতে থাকে, 'নাউন', 'ভারব', 'অ্যাডজেকটিভ' ইত্যাদি। আর এর মধ্যে তাকে শিখে নিতে হয় ইংরেজির অতিশয় জটিল এবং বেশ অনিয়মিত বানান পদ্ধতি। অর্থাৎ এ ভাষা শেখা নয়, পড়া ও লেখার জন্য ভাষা শেখা।

এতে ঐ চার থেকে দশের ফর্মুলা যে কাজ করে না বিদেশী ভাষাতাত্ত্বিকরাই সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। স্কুলের ভাষা শিক্ষায় কী শেখানো হয় তার উত্তরে একজন ভাষাশিক্ষাবিদ বলেন, "A number of things that we teach him go beyond language in the strict sense of the term. First, we teach him to read and write—and children do not possess an innate faculty to learn these skills effortlessly (মৌখিক ভাষাশিক্ষায় তাদের ঐ innate faculty আছে

কিন্তু—প. স) but must work hard at them (মৌখিক ভাষাশিক্ষায় পরিশ্রম বা চেষ্টারও দরকার নেই-প. স) Second, we teach him how to handle the special styles of witten English, which are by no means simply the style of spoken English put down on paper. Third, we teach him such practical uses of written English as how to open and close letters, how to write and answer invitations, and the like. Finally, we teach him to read and understand some of the great things that have been written in the English language.[19]

অর্থাৎ স্কুলে ভাষাশিক্ষাতে শেখানো হয় ১. লিখতে-পড়তে, ২. লেখার বিশেষ ভাষারীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে, ৩. চিঠি শুরু ও শেষ করা, নেমন্তন্নের চিঠি, বা দরখাস্ত ইত্যাদি বিশেষ জিনিস লিখতে, ৪. কিছু সাহিত্য। এতে শিশুর মুখের ভাষা শিক্ষার ঐ স্বভাবজ (innate) দক্ষতা যে কোনো কাজেই লাগে না তা তো স্পষ্ট। মোলটন এখানে সংশয়ের কোনো অবকাশই রাখেন না। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও জানি যে, যে-ছেলে মুখের ভাষা চটপট শিখে নেয়, তার হাতের লেখা, বানান, ভালো পড়তে শেখা অর্থবোধ, ব্যাকরণের নিয়ম শেখার সঙ্গে ঐ মুখের ভাষা শিক্ষার কুশলতার কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। প্রথমটা চেষ্টাহীন সহজ উপার্জন, দ্বিতীয়টা সচেষ্ট, শ্রমসাধ্য শিক্ষা। মুখের ভাষায় দক্ষতা যদি লেখাপড়ার language skill-এ দক্ষতার গ্যারান্টি হত, তাহলে ভারতীয় ইংরেজিভাষী মানবগোষ্ঠী স্কুল-কলেজে ইংরেজির সফলতম ছাত্রছাত্রীদের জোগান দিতে সমর্থ হত, এবং বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা বাংলা পরীক্ষায় কখনো অকৃতকার্য হত না। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা তারা অনেকেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইংরেজিতে খুব খারাপ ফল করে তার খবর প্রচুর পাওয়া যায়। স্কুল পরিত্যাগকারী ইংরেজ ছেলেদের ইংরেজিতে দখল "regrettably low" এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আসা ইংরেজ ছাত্রদের এ ভাষায় "appallingly low level of performance"-এর[20] কথা উল্লেখ করেছে দুটি উৎস। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌখিক ভাষায় দক্ষতা লিখতে-পড়তে শেখায় খুব সামান্যই সহায়তা করে। কাজেই চার থেকে দশ বছরের মৌখিক ভাষা শেখার স্বাচ্ছন্দ্যের ফরমুলা স্কুলের ভাষাশিক্ষার উপরে প্রয়োগ করা অনুচিত এবং অসংগত।

এ কথা বলা যেতে পারে যে, কেন, মুখেই শেখানো হোক না ইংরেজি! বাংলা দেশের প্রত্যেক প্রাইমারি স্কুলে স্পোকেন এবং রিটন দুরকম ইংরেজিই

শেখানো হোক। পৃথিবীর অনেক দেশেই, বিশেষত ধনী দেশগুলিতে, মূলত মুখেই শেখানো হয় বিদেশী বা দ্বিতীয় ভাষা। মার্কিন দেশের ক্যালিফোরনিয়া অঞ্চলের FLES বা Foreign Language in Elementary Schools প্রকল্পে ভাষা শেখানোর ধাপগুলি হচ্ছে HEAR—SAY—SEE শোনো, বলো, ছাখো।[২১] সেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ বছরের আগে লিখতে শেখানো হয় না। রবার্ট লোডো (Lado) তাঁর 'সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লারনিং' বইয়েতেও বলেছেন 'স্পীকিং ফার্স্ট'। পশ্চিম বাংলার ৪৭০০০ প্রাথমিক স্কুলে ঠিক এই ধরণে ব্যবস্থা করতে হলে কী কী দরকার তার তালিকা দিই :

১) ইংরেজি মাতৃভাষার মতোই স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন এমন শিক্ষক ; (২) শুধু ভাষা বলতে পারেন তা নয়, এ শিক্ষক ভাষাতাত্ত্বিকও বটে, কারণ ও ভাষার মূল নীতিগুলি তিনি নিজে বুঝছেন এবং ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন ; (৩) যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চারণ ও বাক্য ব্যবহারের classroom practice ; (৪) নানা শ্রুতি-দর্শন যন্ত্রপাতির (audiovisul) ব্যবহার। অর্থাৎ টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, ফিল্ম, ভিডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদি ; ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা ; (৫) মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের environmental tour অর্থাৎ যেখানে ভাষাটা মাতৃভাষা হিসেবে বলা হচ্ছে সেখানে বেরিয়ে আসা ; (৬) ক্লাসরুমের বাইরেও ভাষা-অভ্যাস অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা, অর্থাৎ বাড়িতে এসেও ছাত্র যাতে টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেট চাপিয়ে শুনতে পারে তার সুযোগ ; (৭) উপযুক্ত পাঠ্যবই ও ক্যাসেট, রেকর্ড ইত্যাদির সৃষ্টি।

এই গরিব দেশে কোনো সরকারকে বলা সম্ভব যে, এইগুলি আমাদের দিতেই হবে ? যেখানে শতকরা সাতষট্টি ভাগের অক্ষর-পরিচয় নেই—প্রথম ভাষাটাই তারা ভাল করে শিখে উঠতে পারে না—সেখানে দ্বিতীয় ভাষার জন্য এত অপব্যয় ? এর শতকরা একভাগও কি আমরা করে উঠতে পারব ? একজন যোগ্য শিক্ষক, সেই সঙ্গে একটি টেপ-রেকর্ডার কি দিতে পারব প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলে ? যতদিন সে সামর্থ্য না হয় ততদিন এসব তাত্ত্বিক কচকচি কেমন যেন নিষ্ঠুরতার মতো শোনায়। প্রথম ভাষাটির বর্ণ-পরিচয়ই হল না কত শিশুর—তা নিয়ে তো তত্ত্ব প্রচার করতে শুনি না, বলতে শুনি না, এই পথে আরো তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে অক্ষরজ্ঞানের আলো পৌঁছুবে। *দ্বিতীয় ভাষা নিয়ে এ শোরগোলের মধ্যে প্রথম ভাষার আর্তনাদ যেন কারো* কানেই পৌঁছুচ্ছে না।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

১. L1 মাতৃভাষা, L2 দ্বিতীয় ভাষা, L3 তৃতীয় ভাষা ইত্যাদি।

২. ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে ইংরেজি L2 নয়। অন্যে তা তৃতীয় ভাষা।

৩. দ্র. Mitra, Dr Ramesh Chandra, "Education", (445) in Sinha, N. K., (ed), The History of Bengal 1757-1905, 1967 Calcutta, The University of Calcutta, pp. 429-471.

৪. ঐ, P 448. ৫. ঐ, P. 448

৬. দ্র. Mukherjee, Profs. Haridas and Uma, The Origins of the National Education Movement 1957, Calcutta, Jadavpur University, p 80.

৭. দ্র. Goel, B. S. & Saini, S. K., Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education, 1972, New Delhi, National Council of Educational Research and Training (NCERT), P. 23-21

৮. Dakin, J., Tiffen, B., & Widdowson, H. G., Language in Education, 1968, London, Oxford University Press P. 31.

৯. ৬-এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য, পৃ ৭২। ১০. ৭-এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য পৃ. ...

১১. Fishman, J, Cooper, R., এবং Conrad, A. W. সম্পাদিত The Spread of English, 1977, Rowley (Mass), Newbury House) বইয়ের 18-21 পৃষ্ঠায় উৎকলিত সারণী থেকে ছক তৈরী করেছি।

12. ঐ; ফিশম্যান ও কনরাডের লেখা প্রবন্ধ "English as a World Language" (3-76)-এর 54-55 পৃ দ্রষ্টব্য।

১৩. ঐ, পৃ. 55-56। ১৪. রমেশচন্দ্র মিত্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ (টীকা ৩ দ্র.)। ১৫. ঐ প্রবন্ধে উল্লিখিত।

১৬. নীহার রঞ্জন রায় "মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট আর এক দিক", ... 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৮ পৃষ্ঠা। ১৭. ঐ।

১৮. সুনন্দ সান্যাল। বাঁকুড়ায় WBCUTA সম্মিলন উপলক্ষে ... 'Handout' ১ পৃষ্ঠা।

১৯. Moulton William G. "The study of Language and Human Communication, A. H. Marckwardt সম্পাদিত (১৯৭০) Linguistics in School Programms (The Sixty-ninth year book of the National Society for the Study of Education), Chicago.

২০. Pride. J. B., 1971, The Social Meaning of Language London, Oxford University Press, P. 79 (উদ্ধৃত)।

২১. দ্র. Stack, Edward M., 1971, The Language Laboratory and Modern Language Teaching, London, Oxford University Press, P. ix.

শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণে শিক্ষা-ক্রমের ভূমিকা

শ্রীভবেশ মৈত্র

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে মানুষ আজীবন কিছু না কিছু শেখে। এই শেখার মাধ্যমেই আমাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়, জ্ঞান বাড়ে এবং দক্ষতা হয় পারিশীলিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে। মানুষের দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশও ঘটতে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান দেহ ও মনের বিকাশ ধারাকে পর্যবেক্ষণ করে মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার ও বিভিন্ন সূত্র নির্ধারণ করেছে।

শিক্ষা আমরা প্রথমতঃ লাভ করি আমাদের জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। কাজ করতে করতে মানুষের শেখার কাজ এগিয়ে চলে। তবে এ কাজ বলতে শুধু অর্থকরী কাজই বোঝায় না। মানব শিশু অতি শৈশবকাল থেকেই নানা-ধরণের অঙ্গ সঞ্চালন ও খেলাধূলার মাধ্যমে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতা সে অর্জন করে ব্যক্তি, বস্তু ও পরিবেশ সম্পর্কে। বিভিন্ন বস্তু ও ও বিষয় সম্পর্কে ধারণাও গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। এইভাবে যতই তার বয়স বাড়ে ততই তার জানার পরিধি প্রসারিত হয়। এইভাবে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে থাকি তাকে আমরা বলে থাকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা। এই শিক্ষাকে আমরা সমগ্র জীবনের (Living) সমার্থক বলে ধরে নিতে পারি। এবং যেহেতু এই শিক্ষা জীবন (Living) থেকে উদ্ভূত সেই হেতু তা জীবনের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত। তাই মানুষের জীবনে এই শিক্ষা তার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। পক্ষান্তরে বলা চলে মানুষের বিকাশ-ধারা ও শিক্ষা ধারা সমার্থক।

তবে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের সমস্ত শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষ অন্যের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক কিছু শিখে থাকে। পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে চলে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ। এইভাবেই প্রত্যেকের জ্ঞান ও দক্ষতা পারিশীলিত, পরিমার্জিত ও পুনর্গঠিত হয়। তবে অন্যের কাছ থেকে পাওয়া কিছু কিছু বক্তব্য ও ধারণা মানুষ স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেও মেনে নেয়। এইভাবে কিছু কিছু বিশ্বাস গড়ে ওঠে—যার কোন ব্যাখ্যা সে দিতে পারে না। অন্যের কাছ থেকে শুনে যেমন অন্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, তেমনি অন্যের লেখা থেকে অনেক কিছু জানা ও শেখা যায়। এই সমগ্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ জ্ঞান ও দক্ষতা

অর্জন এবং বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। এইভাবে যে শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সাবলীলতা। এ ধরণের শিক্ষায় শিক্ষকের সচেতন প্রয়াসের তেমন প্রাধান্য থাকে না। এখানে প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীর পরিবেশই তার শিক্ষক। তবে এক্ষেত্রে সমস্যাও অনেক। একটি অনভিজ্ঞ ও স্বল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিশুর পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও অস্পষ্ট বিষয়বস্তু সমন্বিত পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া সবকিছু তার নাগালের মধ্যেও থাকে না। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় মানুষ যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছে, অন্যের সাহায্য ছাড়া সে সব জানা, বোঝা বা আয়ত্ব করা কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

এবারে এসব সমস্যা সমাধানে সমাজের বয়স্করা এগিয়ে এলেন—সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে লাগলেন। গড়ে তুললেন পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। অর্থাৎ কি জানানো হবে, কি শেখানো হবে এবং কতটুকু কোন বয়সে শেখানো হবে, এ সবই পূর্বনির্ধারিত ছক অনুযায়ী চলে।

দেহের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য যেমন মানুষ খাবার খায় বা তাকে খাবার পরিবেশন করা হয়, তেমনি মানসিক পুষ্টি ও বিকাশের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশন করা হয়। সব বয়সের ছেলেমেয়েকে যেমন, সব খাবার খেতে দেওয়া হয় না এবং শৈশবের পুষ্টি সাধনের জন্য বিশেষ খাবারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনি জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও বয়স অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা প্রয়োজন। যে কোন বয়সে যা ইচ্ছা শেখানোর চেষ্টা শুধু অবিবেচনা প্রসূতই নয় অবৈজ্ঞানিক। বিশেষ করে শিক্ষাকে যদি আমরা সহজ-লভ্য, সহজ-বোধ্য ও সকলের জন্য করতে চাই, তবে এ বিষয়টি শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে শুধুমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়ের বিন্যাসের তারতম্য ঘটিয়েই শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত বা সংকুচিত করা যায়। একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল কতবেশী মানুষ কত বেশী দিন শিক্ষালাভের সুযোগ নিতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। তাই মুষ্টিমেয় মানুষের চাহিদা, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচিত হবে তা অধিকাংশের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না—ফলে অধিকাংশই বঞ্চিত থাকবে শিক্ষার সুযোগ থেকে।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা শ্রেয় ও কাম্য; এবং কোন স্তরে ক'টি ভাষা এবং কোন্ কোন্ ভাষা শেখান হবে। নিজের মুখের ভাষায়, নিজের ভাব ও ভাবনার ভাষায় শেখার সুযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার এবং গুণগত উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার মাধ্যমের শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে সত্য। যে শিক্ষার্থীরা ভিন্ ভাষায় লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হয় তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ করতে ও আপন করে নিতে খুবই কষ্ট হয়, অনেকে প্রকৃতপক্ষে আত্মস্থ করতে সক্ষমই হয় না। তোতাপাখীর মত মুখস্থ করেই তাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়। তাই এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নীচের স্তরের সাফল্যের তুলনায় উপরের স্তরের সাফল্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক। গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে নিজ ভাষায় শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের বঞ্চনার ভাগটাই বেশী। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যখন কিছু কিছু শিক্ষিত লোককে বলতে শুনি যে আমাদের দেশে যারা ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। কোন্ সুবিধা বিশেষভাবে ভোগ করে তারা? শিক্ষালাভের জ্ঞানার্জনের বিশেষ সুবিধা? নৈব, নৈব চ। বরং বলা চলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তো তারা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পৃথিবীতে কোন সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীকে কখনও বলতে শোনা যায় নি যে, "নিজের ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় শিক্ষালাভে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।"

সমস্যাটা অন্য খানে। 'ইংরেজী বলতে কইতে পারা সাধারণভাবে উন্নততর যোগ্যতার নিদর্শন'—এই মানসিকতাই আমাদের অনেককে 'ঘানির চোখ বাঁধা বলদের মত' একই বৃত্তে ঘোরাচ্ছে। কট্টর ইংরেজীভক্ত প্রভাবশালী চক্র আমাদের এই মানসিক দুর্বলতাকে ব্যবহার করে সমস্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

একটি দেশের জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সে দেশের সম্পর্কের ব্যাপকতার উপর নির্ধারিত হবে সে দেশের স্কুল-কলেজে পাঠরত ছেলেমেয়েরা তাদের নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিখবে কিনা। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা চলে যে, আমাদের যে-সব ছেলে-মেয়ে বার বছরের স্কুল শিক্ষা শেষ করবে তারা নিজ ভাষা ছাড়া অন্ততঃপক্ষে আর একটি ভাষা ব্যবহার করতে শিখবে। এবং

এই মুহূর্তে তা ইংরেজী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে এই দ্বিতীয় ভাষাটির ভূমিকা কখনই মাতৃভাষার ভূমিকার সমতুল্য হতে পারে না। আর পারে না বলেই তা কখনও মাতৃভাষার বিকল্প হিসাবে কল্পনা করা চলে না। তাই মাতৃভাষার ভিত শক্ত হওয়ার পরই দ্বিতীয় ভাষা শেখা সুরু করা ভাষা-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা। একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা-শিক্ষার ভিন্ন পরিকল্পনার কোন স্থান থাকতে পারে না। কোন গণতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শেখান হয় না।

একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক শিক্ষাক্রম (curriculum) রচনার ক্ষেত্রেও এই একই নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সে নীতির মূল কথা হ'ল, একজন শিক্ষার্থী একটি বিশেষ শিক্ষাকর্মসূচী সম্পূর্ণ করলে ব্যক্তি ও সামাজিক চাহিদার পরিপূরক কতগুলি জ্ঞান ও দক্ষতা সে অর্জন করবে এবং তার মধ্যে কতগুলি কাম্য মানবিক গুণ ও সমাজ কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে। তাহলে শিক্ষাক্রম অন্তর্ভূক্ত বিষয় ও করণীয় কাজ এবং বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচীকে এমন ভাবে নির্বাচিত করতে হবে যেন সেগুলি গণতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শকে রূপায়িত করার উপযোগী হয়। এ দায়িত্ব ও অধিকার কার? যে শিক্ষালাভ করবে অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের এক্ষেত্রে ভূমিকা খুবই সীমিত। রাষ্ট্র ও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ও জনজীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে শিক্ষাসূচীতে গণতান্ত্রিক উপাদান কতটা স্থান পাবে এবং সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটা একজন শিক্ষার্থীকে এবং সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটা একজন শিক্ষার্থীকে কতটা গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা গঠনে এবং তারই অনুযায়ী দক্ষতা, যোগ্যতা, অভ্যাস ও কর্মকুশলতা অর্জনে সাহায্য করতে সফলতা লাভ করবে।

দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ লালিত হয়েছে একটি সামন্ততান্ত্রিক এবং ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। সে যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা সবাই একমত হব যে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। স্বাধীনতা পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হয়েছে বারে বারে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিকতার বিকাশ ঘটতে পারে নি। বাধা ও পিছটান নিশ্চয়ই রয়েছে যা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক উপাদান

সমৃদ্ধ হতে দিচ্ছে না। এখনও আমরা অনেকেই শিক্ষাকে কয়েকটি বিশেষ চাকরীর জন্য যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে দেখি এবং শিক্ষার সার্থকতা বিচার করি কেবলমাত্র ঐ একটি মাপ কাঠিতে। সমস্ত মানুষ, সমস্ত মানুষের শিক্ষার অধিকার, তাঁদের প্রয়োজন, শিক্ষা-নিয়ামকদের চোখের সামনে বা মনে থাকে না। আমরা সেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই। মুষ্টিমেয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ মানসিকতা ও অভ্যাসকে ভিত্তি করেই তাদের শিক্ষাচিন্তা বিবর্তিত হয়। শিক্ষকদেরও এক বিরাট অংশ অভ্যাসবশতঃ স্থিতাবস্থার পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন। ফলে কোন পরিবর্তন আনলেও তাকে কার্যকর ও রূপায়িত করা খুবই কষ্টকর হয়।

মানব সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই নির্ভর করে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আমরা কি ধরণের পরিবর্তন বা কোন্ কোন্ গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে চাই। স্বভাবতই এ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেবে। ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের ভারতবর্ষে খুব সহজ ব্যাপার নয়। সামাজিক অনাচার, অবিচারের কারণ সম্পর্কে সচেতন হতে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গঠনে সাহায্য করতে পারে এরূপ লক্ষ্যাভিমুখিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপদানের পথে অজস্র বাধা। আমাদের সমাজের থাকে থাকে এই সমস্ত পশ্চাৎপদ ও সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তি রয়ে গিয়েছে। শোষণ-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাটা যাঁরা কায়েম রাখতে চায় তাঁদের সঙ্গে এই সমস্ত পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণার কোন মৌলিক বিরোধ নেই। তাঁরা বরং এই সমস্ত শক্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেই সাহায্য করে। বহু যুগ সঞ্চিত লড়াইয়ের ফসল হিসাবে শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটের অধিকার লাভ করেছেন। যাঁরা তাঁদের এই অধিকারকে কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের নেতৃত্বে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক উপাদান কতটা সার্থকভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

এ জগতে হঠাৎ কিছু ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনার পিছনেই কারণ আছে। কারণগুলি আমাদের জানা না থাকলেও কারণ যে নিশ্চয়ই আছে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি গণতান্ত্রিক শিক্ষাক্রমে একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হওয়া সঙ্গত। কিন্তু কোন দৈব-বিশ্বাসীদের দ্বারা সংগঠিত শিক্ষা পরিকল্পনায় এই সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার অবকাশ থাকবে কি ?

শিক্ষার প্রসার এবং ইংলিশ স্কুল

শ্রীপ্রভাত কুমার গোস্বামী

একটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে যেমন চাই শিক্ষার মান-উন্নয়ন, তেমনি চাই শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা। তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে প্রসারের উপরই বেশী জোর দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা গোটা দেশ ডুবে রইলো অন্ধকারে, তেলের প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা হলো না ঘরে ঘরে, অথচ দু'একটি বাড়ীতে জ্বালানো হলো বিজলীর আলো! এটা উন্নতির লক্ষণ নয়।

আমাদের এই দেশে আমরা যেমন এক সময়ে দেখেছি চতুষ্পাঠির সঙ্গে টোল; পরবর্তী কালে মক্তবের সঙ্গে মাদ্রাসা; ইদানীং কালে স্কুলের সঙ্গে কলেজ। আগে রাজা-রাজড়াদের সন্তানদের শিক্ষার জন্যে রাজবাড়ীতে পৃথক বিদ্যালয় থাকতো, ধনবান ব্যক্তিরাও এই প্রথা অনুসরণ করতেন। তবে সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্যে পাঠশালার শিক্ষা-ব্যবস্থা সব সময়ই উন্মুক্ত ছিল। সে পাঠশালার পাট আজকের মতো না হওয়ায় তা বসতো যে কোন জায়গায়।

বৃটিশ শাসনে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হবার ফলে পাঠশালার কৌলিন্য গেল কমে—তখন মিডল ইংলিশ স্কুল, হাই ইংলিশ স্কুল নাম নিয়ে যে শিক্ষালয়গুলি পত্তন হলো সেগুলির সঙ্গে নানা কারণে বৃহত্তর জনসাধারণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারলো না। এই ধরণের স্কুল গড়ে উঠার ফলে চতুষ্পাঠির মতো মেঘ ডাকলে ক্লাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় রইলো না বটে, কিন্তু এই ধরণের বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আদব-কায়দা শিক্ষণীয় অন্যতম ভাষা—সবই বিদেশী। সেই সঙ্গে এগুলি ব্যয়বহুল। ফলে বৃহত্তর জনসাধারণ এই স্কুলগুলি থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হলো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা চার ছ' মাইল হেঁটে গিয়ে বা বোর্ডিং অথবা আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে থেকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলের (এগুলির সংখ্যা কম ছিল) শিক্ষা চালিয়ে গেলেও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেরা মধ্য ইংরাজী স্তরে পৌছাবার আগেই রণে ভঙ্গ দিত। আজ মধ্য ইংরেজী বা উচ্চ ইংরেজী এসব নাম না থাকলেও কাঠামো মোটামুটি একই রকম রয়েছে এবং এগুলির নীচে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। যেহেতু এই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষার স্থল তাই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে তা এখান থেকেই সুরু করতে হবে। এর জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার প্রথমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালেন, প্রতি গ্রামে

একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন, বিনামূল্যে টিফিন এমন কি বিদ্যালয়ে পরে আসবার মতো সাধারণ পোষাকের ব্যবস্থা করলেন।

এটা গেল একটা দিক। অন্য দিক হচ্ছে পাঠক্রমের দিক। জীবনমুখী পাঠক্রম প্রণয়নের সঙ্গে যে বিশেষ সিদ্ধান্তটি নেওয়া হলো বা হচ্ছে "প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও ভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে না"।

এই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা সুবিধাভোগী বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনঃপূত হয়নি। তাই একদিকে যেমন ইনজাংসন দিয়ে নতুন স্কুলের প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া হয়েছে, তেমনি প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা বর্জনের ব্যাপার নিয়ে বহু হৈ চৈ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গেই আসছে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের কথা। অর্থাৎ এই স্কুলগুলি যখন থাকছে এবং এই স্কুলগুলিতে যখন প্রথম থেকেই ইংরেজী শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে তখন অন্য স্কুলগুলি দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজী ভাষা) বর্জন করলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; দু' শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সৃষ্টি হবে। এক শ্রেণী ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হবে, অপর শ্রেণী ইংরাজী না শেখায় পিছিয়ে পড়বে। কারণ এখনও এ দেশে চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজীর আদর সব চেয়ে বেশী।

এটা অবশ্য সবাই স্বীকার করবেন যে, সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে এ রাজ্যে ইংরেজী মিডিয়ম স্কুলের সংখ্যা অতি নগণ্য। সাধারণ প্রাইমারী স্কুলে ইংরেজী পড়ানো নিষিদ্ধ হওয়ায় যদি কিছু সংখ্যক ঐ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে তবুও সংখ্যার তা বেশী কিছু নয়। সরকারী অনুমোদন এবং সাহায্য ছাড়া এই ধরণের ব্যয়বহুল স্কুল অধিক সংখ্যায় চলতে পারে না।

যদি এই মানসিকতা কোনও শ্রেণীর লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, তাঁর সন্তানদের ইংরেজী পড়াতেই হবে, তবে ইংরেজী স্কুল না থাকলেও তাঁরা বাড়ীতে শিক্ষক রেখে ইংরেজী শেখাবেন; অর্থ থাকলে বিলেতে পাঠিয়ে সন্তানদের ইংরেজীনবিশ করে আনবেন। যে দেশের লোক এককালে সন্তানকে 'বৃটিশ বর্ণ' করবার জন্যে গর্ভবতী স্ত্রীকে সন্তান প্রসবের আগে বিলেত পাঠাতেন সে দেশের লোকেরা প্রয়োজন বোধে ভারতের বাইরেও ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। বাড়ীতে মেমসাহেব রেখে ইংরেজী শেখানোর রেওয়াজ এদেশে ছিল, এখনও আছে।

আমাদের দেশে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলগুলি চালিয়ে আসছে প্রধানত বিদেশী মিশনারী, একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং সামান্য কিছু সংখ্যক হঠাৎ গজিয়ে উঠা

ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি। আইন করে এই ধরণের স্কুল বন্ধ করা যায় না বা এই সব স্কুলের ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করা যায় না। তা করতে হলে সংবিধান সংশোধন করা দরকার। সেটা কে করবে? তাই স্কুলগুলি থাকছে। তবে মোট শিক্ষার্থীর অতি সামান্য এক ভগ্নাংশ ছাড়া ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ঐসব স্কুল করতে পারে না। তার মূল কারণ অর্থনৈতিক, যে দেশে বিনাবেতনে শিক্ষা চালু থাকা সত্ত্বেও সবাই স্কুলে যেতে পারে না, সেখানে মাসে ৭৫ থেকে ১২৫ টাকা দিয়ে বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে মাসিক ১৫ থেকে ২৫ টাকা দিয়ে অধিকাংশ লোক ছেলেমেয়ে পড়াবে—এটা চিন্তা করা যায় না।

এই ধরণের স্কুলে মোটামুটি ভাবে ছেলেমেয়েরা পাঠ শুরু করে তিন বছর বয়স থেকে। প্রাথমিক স্তরে পৌঁছানোর আগে থাকে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর। সেখানে ইংরেজী ভাষায় হাতে খড়ি। প্রাথমিকে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা ভাষা এবং অন্য বিষয়গুলির মাধ্যম ইংরেজী। এইসব স্কুলে ভাষা-সাহিত্যের বই পড়েই শুধু শিক্ষার্থীরা ইংরেজী শেখে না, অন্য বিষয়গুলিও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শেখে বলেই ইংরেজী ভাল শেখে। এইসব স্কুলকে অনুসরণ করতে হলে প্রাইমারী স্তরে শুধু বাংলার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা সাহিত্য পড়ালেই চলবে না—ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। পৃথিবীর কোনও দেশেই প্রাথমিক স্তরে বিদেশীর ভাষা শেখানো হয় না এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমও নয়।

দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের আওতায় থেকে আমাদের মনে যে সংস্কার দানা বেঁধেছে সেই সংস্কার বশে যদি ধরেও নিই যে, প্রথম থেকেই ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য শিখলে এবং ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম হ'লে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত হব, তাহ'লে প্রশ্ন আসবে যে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক'জন উচ্চতর পরীক্ষায় উচ্চস্থানে দাঁড়াতে পারে—কতজন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সাধারণ স্কুলে পড়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে? একমাত্র কথা-বেচে-চাকুরী যেখানে সেখানেই এরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করে—বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে এদের বেশীর ভাগ তত অগ্রসর হতে পাবে না।

এইসব ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি কি ধরণের? এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে শিক্ষা-পদ্ধতির একটু আলোচনা করা যাক। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দু'টি প্রধান কাজ: পড়ানো এবং পড়া গ্রহণ করা। পাঠ্য বিষয়কে বিস্তারিতভাবে পড়িয়ে দিতে হবে, তাকে অবলম্বন করে সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে এবং পড়িয়ে দেওয়া বিষয় শিক্ষার্থী আয়ত্ব করতে পারলো কিনা তার পরীক্ষা নিতে হবে। অধিকাংশ এবং বিশেষভাবে বৃহৎ ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে প্রথম কাজটি হয় না; দ্বিতীয় কাজটি খুব ভালভাবে হয়। সোজা কথা, ঐ সব স্কুলে পড়ানো

হয় না, পঠিতব্য বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় একেবারে রুটিন করে। শিক্ষার্থীদের জানানো হয় কতটুকু পড়ে আসতে হবে, ওরা নিজেরা পড়িয়ে দেবেন না। এর উদ্দেশ্য সরল। সমস্ত দায়ভাগটা অভিভাবকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তিনি হয় নিজে পড়ান, না হয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে থেকে কাউকে 'টিউসন টিচার' রাখুন। কঠোর নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে এই কাজ রুটিন বেঁধে চলে। যারা অর্থ ও সামর্থে পাল্লা দিতে পারে তারা টিকে থাকে নতুবা পিছিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণী সুরু হয়েছিল পাঁচটি সেকসন নিয়ে, সেটি মাধ্যমিক-এ একটি বা দুটী সেকসনে টিকেছে। মাঝপথে ডুবে গেছে তিন বা চারটি সেকসন।

কিন্তু তবুও কেন এক শ্রেণী এই সব স্কুলের পেছনে ছোটে? সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীই এগুলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কারণ প্রায় চল্লিশ বছর আগেও কলকাতার নামকরা মিশনারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বেতন ২০ টাকার নীচে ছিল না। এই টাকা দেবার ক্ষমতা সেদিনের পঞ্চাশ ষাট টাকা বেতনের কেরানীর বা শিক্ষক-শিক্ষিকার ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফাঁপাই টাকায় একদলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটার পর থেকে ঐ ধরণের স্কুলের চাহিদা বাড়তে থাকে। তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের বেতন বাড়তে থাকে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে ঐ সব স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেন। এই সব স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে গণমুখী নয়—এটা জানা সত্ত্বেও আমরা যারা গণ-আন্দোলনের সুফল হিসেবে অধিকতর বিত্ত লাভের সুযোগ পেয়েছি, তারাই সেখানে ছেলে মেয়েদের পাঠাচ্ছি।

কোনও কোনও সদাগরী প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার দূরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পৌছে দিচ্ছেন। এদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও কেউ কেউ যে পাল্লা দিচ্ছেন না এমন নয়।

এটা কি শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষা শেখার জন্যে? না, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ঐ সব স্কুলে লেখাপড়া করলে শিক্ষার ভিত্তি শক্ত হয়। তার প্রধান একটা কারণ কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে গড়ে উঠতে হয়।

এইটাই একটা চ্যালেঞ্জ। সব স্কুলগুলিকে এই ব্যাপারেই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। যে সব স্কুলে কঠিন নিয়মানুবর্তিতা আছে সেই সব স্কুলেরই পড়াশুনা ভাল হতে বাধ্য। এটা শুধু শিক্ষক শিক্ষিকার বেতনের ওপর নির্ভর করে না। তা যদি করতো তা হলে কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুলগুলির দুরবস্থা কেন? এই সব স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন অনেক আগে থেকেই অন্য স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের চেয়ে বেশ ভাল। অথচ অন্য স্কুলগুলির তুলনায় কর্পোরেশন স্কুলগুলির নিয়মানুবর্তিতা, পড়াশুনা মোটেই ভাল নয়। এই কারণেই এই সব স্কুলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষও সন্তানদের পাঠাতে চান না।

কর্পোরেশন স্কুলই হোক বা অন্য বেসরকারী স্কুলই হোক সবাইকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির সঙ্গে শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগোতে হবে। তা হলেই অভিভাবকদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে।

একথা স্পষ্টই বলা দরকার যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের মতোই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রবণতা এবং লক্ষ্য। অবশ্য এই ধরণের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের একাংশের ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনও কোনও বিষয়ে একচেটিয়া মালিকানা রয়েছে। তাই অনেক বেশী আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে এরা শুধু স্কুল কলেজ নয়, সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রেও একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠার দিকে যাচ্ছে। খৃষ্টান এমন কি হিন্দু মিশনারী যারাই স্কুল চালাচ্ছেন তাঁদেরও উদ্দেশ্য ঐ একচেটিয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার আওতায় একদল বিশেষ মানসিকতা সম্পন্ন শ্রেণী গড়ে উঠবে। পরিচালন ব্যবস্থার দিক থেকে বিড়লার বিভিন্ন কনভেন্ট এবং রামকৃষ্ণ মিশন এদের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। গণশিক্ষার বা শিক্ষার প্রসারের দিকে এদের কারও লক্ষ্য নেই। এরা "মিশনারী জীল" নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছাড়িয়ে পড়ে যদি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নিজেদের কর্মক্ষেত্র স্থাপন করতে পারতেন এবং গণশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করতেন তাহলে কথা ছিল না। এরা সহরে বা সহরতলীতে আভিজাত্যের প্রাচীর ঘেরা বিদ্যালয়ের কুণ্ড তৈরী করেছেন। সেখান থেকে সামান্য গণ্ডূষ বারি গ্রহণের জন্য যে প্রণামী দিতে হয় তা দেবার ক্ষমতা এদেশের মানুষের নেই। আভিজাত্য বজায় রাখার জন্যেই ঐ সব বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী, অর্থাৎ শিক্ষার প্রসার নয়, শিক্ষার আভিজাত্য কিনি করার ব্যবস্থা। সমাজের এক শ্রেণীর এই আভিজাত্য বজায় রাখার জন্যে অধিকাংশ লোকের সন্তানদের সামনে আপনা আপনি সৃষ্টি হয় প্রবল বাধা। সাধারণ কৃষক ও সাধারণ মজুরদের ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রথমেই হোঁচট খায়। শুধু মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে যারা নিরক্ষতার বদনাম ঘোচাতে পারতো, তারা প্রতিকূল পরিবেশে বিদেশী ভাষা নিয়ে বিব্রত হয়ে ঘরে ফিরে যায়। তা সত্বেও বিদেশী ভাষাসহ অভিজাত শিক্ষা-ব্যবস্থাই একদল বুদ্ধিজীবী বজায় রাখতে চান। এঁরা চান দুধের মাখন তুলে সুবিধাভোগীদের পরিবেশন করতে। কিন্তু আজ মাখনের চেয়েও বেশী প্রয়োজন দুধ। সেই দুধ পরিবেশন করবে সাধারণ বিদ্যালয়গুলি এবং সেটা মাতৃদুগ্ধ দিয়েই সুরু হোক।

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা একমাত্র ভাষা

ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভাষাশিক্ষা নীতির দিক থেকে

সর্বস্তরে মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম,—এবিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভাষা বিতর্কের বিষয় এ নয়। এও উদ্ভুত বিতর্কের বিষয় নয় যে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী থাকবে কি থাকবে না। ইংরেজী না থাকলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে বা আমাদের দেশ পেছিয়ে পড়বে একথা বিবেচকরা বলবেন না। ইংরেজী ব্যতীত জাপান, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি ব্যাহত হয়নি। এমন কি পশ্চিমা জ্ঞানের যা হিতকর অংশ তা এ-সব দেশে নিজ নিজ ভাষায়ই বিস্তার লাভ করেছে। বিদেশী ভাষার গ্রহণ আর স্বদেশের উন্নতির বিষয় একাকার করে দেখা সমীচীন নয়। কিন্তু বিবেচকরা ভাষাশিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজনের দিক বিচার করে এও স্বীকার করবেন ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষা এখনও শিল্পের ভাষা, বাণিজ্যের ভাষা, গ্রন্থাগারের ভাষা। যতদিন ভারতীয় একটি ভাষা ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করতে না পারছে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে অনবধানতা নিদারুণ ভ্রমাত্মক হবে। এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ইংরেজীর সামাজিক প্রয়োজন কোনো অসতর্ক মূহূর্তেও অস্বীকার করে নি। সকলেই চাই, **দেশের সব শিশু ভাল করে মাতৃভাষা শিখুক এবং ভাল করে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শিখুক।**

বিতর্কের বিষয় হলো, কোন স্তর থেকে শুরু করলে শিশু সন্তানটি ভালো করে মাতৃভাষা শিখতে পারবে এবং ভালো করে ইংরেজী শিখতে পারবে,— যাতে তার স্থায়ী লাভ ঘটবে, যাতে তার মাতৃভাষা বা বিষয় শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, তার ভাষাশিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন মিটবে। শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানীজনের পরামর্শ যদি হয়, প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী শুরু করলে সন্তান এভাবে উপকৃত হবে, তবে অভিভাবকগণ চাইবেন সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শুরু করুন। আর যদি জ্ঞানী, বিজ্ঞানীরা বলেন মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু হলে সন্তানের উপকার হবে তবে এই স্তর থেকে শুরু করাই সরকারের উচিত হবে। অভিভাবক সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেন : সন্তানের অধিকতর কল্যাণই তার কাম্য। একটা

জনহিতাকাঙ্ক্ষী সরকার ভাষা শিক্ষার স্থায়ীফল দেশের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে চান। তার লক্ষ্য শিক্ষার অঙ্গন কলহাস্যে পূর্ণ হোক, দেশের সব শিশুর ভাষাশিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন সাধিত হোক।

যারা ভাষানীতি, শিক্ষানীতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, গবেষণা করেন, কমিশন কমিটিতে পরামর্শ দেবার অধিকারী, তাঁদের অভিমত দ্বিতীয় ভাষা শেখাবার আগে মাতৃভাষায় শিশুর যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। সেজন্য তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন প্রাথমিক স্তরে শিশু যদি একমাত্র মাতৃভাষা শেখে এবং মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে যদি দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শেখে, তবেই শিশু ভালো করে মাতৃভাষা শিখতে পারবে এবং ভাল করে ইংরাজী শিখতে পারবে। তার স্থায়ী লাভ ঘটবে। দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জনে শিশু কর্মজগতে উপকৃত হবে। কিন্তু মাতৃভাষার বাধাহীন সহজ আয়ত্তে শিশু বিকশিত হয়। তার কথোপকথনের ক্ষমতার, সহজে নিজেকে প্রকাশ করবার দক্ষতার বিকাশ ঘটে। শিশুর এই বিকাশ যদি কোনোভাবে ব্যাহত হয়, কোনো দক্ষতাই তার আয়ত্ত হয় না। হিতকর ভাষানীতি সজাগ থাকবে—ভাষা শিক্ষায় ভুল থেকে বা ভাষা বিষয়ে মানবিক আবেগ থেকে শিশুর ক্ষতি না ঘটে, ভাষা শিক্ষা যেন তার কাজে লাগে, যেন স্থায়ী ফল শিশু লাভ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে শিশুর নির্ভুল একমাত্র ভাষা এবং এই একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশু স্বচ্ছন্দ, নির্ভুল বই পড়বে, শিখবে, হিসেব করতে শিখবে এবং তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে সে নিজেকে অবাধে মিলিয়ে দেবে। সে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যুঝতে শিখবে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করবে, তার চেতনা বাড়বে। তার মাতৃভাষার এই সাম্রাজ্যে অন্য কোনো ভাষা প্রবেশ করে তার মাতৃভাষার শিক্ষার ধাপে ধাপে বিকাশের গতিকে যেন ক্ষতি করে না দেয়। আবেগ ও অবিজ্ঞান বিজ্ঞানকে পিছু হটিয়ে দিয়ে শিশুর বিকাশকেই যেন বিলম্বিত না করে। প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষা-শিক্ষার দৃঢ়ভিত্তিমূল গড়ে তুলে ছাত্র যখন মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছবে তখন মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা সে সযত্নে শিখবে। **বৃষ্টির জলে নদীজলের বেগ বাড়ে, স্থায়িত্ব আসে। প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাতৃভাষার আয়ত্তে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজীর স্থায়িত্ব ঘটবে।**

● এই দৃষ্টি কোণ থেকেই ভারতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটি-কমিশন

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষাকে সমর্থন করেন নি। ভারতের দু'জন রাষ্ট্রপতি, জাকির হোসেন ও রাধাকৃষ্ণান প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীর পাঠ নিষেধ করেছেন। জাকির হোসেন কমিটি রায় দিয়েছেন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে একমাত্র ভাষা। রাধাকৃষ্ণান কমিশন একই প্রতিবেদন রেখেছেন। "During one to five grade the pupils will learn only the mother language ; in grade six to eight emphasis should be on the mother tongue and the federal language." মুদালিয়র তাঁর Report of the Secondary Education Commission-এ মাধ্যমিক স্তর থেকেই ইংরেজীকে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে রাখতে বলেছেন। কোঠারী কমিশন বলেছেন, যেহেতু গ্রন্থাগারের ভাষা হিসেবে ইংরেজী আরো বহুদিন ভারতে থাকবে, সে কারণে বিদ্যালয় স্তর থেকে ইংরেজী শেখানোর ওপর জোর দেওয়া দরকার। সে-জোর পঞ্চম শ্রেণী থেকে হতে পারে। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর আগে শুরু হবে না। "As English will for a long time to come, continue to be needed as a library language in the field of higher education a strong foundation in the language will have to be laid at the school stage. We have recommended that its teaching may begin in class V but we realize that for many pupils, particularly in the rural areas, its study will not commence before class VIII." ডঃ ত্রিগুণা সেন যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তাঁর সভাপতিত্বে সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির প্রতিবেদনে রয়েছে শিক্ষার প্রথম উপ-বিভাগে শিক্ষার মাধ্যম হবে কেবলমাত্র মাতৃভাষা। আবশ্যিকভাবে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো শুরু হবে পরের শিক্ষাস্তর থেকে—এই ভাষাটি সংবিধানের অষ্টম তালিকাভুক্ত ভাষা হতে পারে কিংবা ইংরেজী ভাষা হতে পারে। শিক্ষার ওপর যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়েছিল তার প্রতিবেদনে রয়েছে (১৯৬৭)—পঞ্চম শ্রেণীর নীচে ইংরেজী পড়ানো হবে না। এরপর শিক্ষার কোন স্তর থেকে ইংরেজী চালু করা হবে তা ঠিক করবে রাজ্য সরকার। ১৯৬৪-তে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত দেবার জন্য একটি study group গঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয়

শিক্ষাদপ্তরই গঠন করেন। এর চেয়ারম্যান ছিলেন গোকাক (Dr. V. K. Gokak)। এই study-এর অভিমত হল মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শেখার সুফল পাওয়া যাবে। "A mastery of the mother tongue is essential as a preliminary step to second language learning if there is to be any real attainment in studying the second language itself." ১৯৫৭-এ গঠিত Report of the official language commission অভিমত দেন ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে এদেশে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাতেই হতে পারে, ইংরেজী ভাষায় নয়। "It is obvious that the vast expansion of literacy and elementary education contemplated in this Directive policy can be conceived only in terms of Indian languages not in terms of the English language." কমিশন আরেক ধাপ এগিয়ে বললো, নিয়মানুগভাবে ইংরেজী ভাষার শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে দেওয়া চলে না। "so far as the teaching of English as a language is concerned it will be seen that English does not feature as a rule as a language for study at the primary stage."

● ভাষা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌রাও প্রাথমিক স্তরে দুটি ভাষা শেখাবার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন। বিশ্ব রাষ্ট্র সংস্থার ইউনেস্কোর তরফ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অনেক গবেষণা ও সমীক্ষা করা হয়েছে। planning in the pirmary school curriculum-এ বলা হয়েছে প্রাথমিক স্তরে একটি মাত্র ভাষায় সাক্ষরতা দান যুক্তিযুক্ত। ইংলণ্ডে রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ডি. এ. উইলকিন্‌স্ (Dr D. A. Wilkins); যুক্তরাষ্ট্রের উইসকান্সিন প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের বিদেশী ভাষা-শিক্ষা ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসর ও ভাষা সম্পর্কিত বহু গবেষণা গ্রন্থের লেখক ফ্রাঙ্ক গ্রিট্‌নার (Frank Grittner); হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক জি. বি. ক্যারোল (G. B. Carrol); জার্মানীর স্কুলে ইংরেজী ভাষার শিক্ষক পিটার ডয়ী (Peter Doye); আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সত্যেন বসু, ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ পট্টনায়ক, ফ্যাকাল্টির সভ্য ডঃ থিরুমালাই—

সকলেই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো ভাষা শিখবার পক্ষে পরামর্শ দেন নি ; বরং নিষেধ করেছেন।

* শরীর বিজ্ঞানীরাও বহু পরীক্ষা করে অভিমত দিয়েছেন, **প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র ভাষা।** তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শিক্ষার ওপর স্নায়ুতন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিপত্য রয়েছে। স্নায়ু জগৎ ভিন্ন ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। এই স্নায়ুতন্ত্রের এলাকাগুলি খুবই প্রণালীবদ্ধ, একের সঙ্গে অন্য পরস্পর জড়িত। মানব শিশুর শিক্ষায় যদি এই প্রণালী নষ্ট হয়, প্রতিবৃত্তচক্র সৃষ্টি হতে পারে। তাতে সুস্থ মানব তৈরি নাও হতে পারে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার সময় ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা চললে এই দুর্দৈবের সম্ভাবনা রয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা শিশু সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে ?

শিশু ভাষা শেখে তার পরিবেশ থেকে। বাঙালী পরিবারের একটি শিশুর পরিবেশে থাকে স্বাভাবিকভাবে তার মাতৃভাষা। মা ও পরিবারের সকলে শিশুকে যখন আদর করে, ঘুমপাড়ানি গান শোনায়, তার সঙ্গে কথা বলে, এটা-ওটা দেখিয়ে চেনায়, সবই করে মাতৃভাষায়। মানব শিশুর কান দিয়ে শোনার এলাকাটি ও কথা বলার এলাকাটি খুবই কাছাকাছি। মাতৃভাষার পরিচিত ধ্বনিরাশি সংজ্ঞাবহ তন্ত্র দিয়ে শ্রবণ-নিয়ন্ত্রণ এলাকা হয়ে কথা বলার এলাকায় অনায়াসে মুদ্রিত হয়। শিশু শুনে বোঝার ও ব'লে ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করে। শিশু যখন পড়তে শেখে তখন চোখ দিয়ে দেখা সামগ্রীর সঙ্গে কান দিয়ে শোনা কথাগুলির যোগসূত্রে লেখা ভাষায় প্রকাশ হয়। সুতরাং বাঙালী শিশুর শিক্ষা যদি তার মাতৃভাষা দিয়ে শুরু হয় স্নায়ুতন্ত্রের এলাকায় ক্রমটি রক্ষিত হয়। তার ফলে শিশুর শিক্ষা স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রক্ষা করতে পারে। বাঙালী শিশুর প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রথম বিপদ, তার পরিবেশে ইংরেজী না থাকায় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমটি নষ্ট হয়। ইংরেজী সে প্রথমে পড়ে, লেখে তারপর বলার চেষ্টা করে। মাতৃভাষা শিক্ষার এক রকম ক্রম, ইংরেজী শিক্ষার ভিন্ন ক্রম। প্রাথমিক স্তরে শিশুর বিভিন্ন ক্রমে শিক্ষা চললে তার মধ্যে প্রতিবৃত্ত চক্র সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশ বিযুক্ত ইংরেজী ভাষার জন্য কথা বলার এলাকাতে নতুন করে সংজ্ঞাবহন মুদ্রিত হবে এবং উপযুক্ত ও সুষ্ঠু উত্তেজনার অভাবে প্রতিবেদন কম বা বেশী হবে। ফলে দেহ ও মনের ক্ষতি সাধিত হবে। শিশুর বিকাশ বিলম্বিত হতে পারে, শিশু জড়বুদ্ধি হতে পারে। সুস্থ মানব মন

তৈরি নাও হতে পারে। এর থেকে রক্ষা পাবার পথ হবে, যদি বাঙালী পরিবার শিশুর জন্ম থেকে পরিবারের মধ্যে এবং তার বিচরণের জগতে একটি ইংরেজী ভাষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে। দ্বিতীয় পথ প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা, মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুজগতের গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটে। যোগাযোগকারী এলাকাগুলি ধাপে ধাপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ৩/১১ বছর বয়স থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ এক বা ততোধিক ভাষা—চাহিদানুযায়ী শিখতে পারে। চর্চা না করলেও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি জমা থাকবে।

এ-ভাবে শিক্ষাবিদরা, ভাষাবিদরা, শারীর বিজ্ঞানীরা শিক্ষাধারা, যেমন বিশ্লেষণ করে অভিমত দিয়েছেন, **প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র ভাষা।** এই শিক্ষা নিয়েই উন্নত দেশগুলিতে যেমন ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাপান, জার্মানী কোথাও প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা-শিক্ষা সরকারী শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়নি।

অর্থনীতির দিক থেকে

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার এরা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যায় একটি বিশেষ প্রবন্ধে ইংরেজী ভাষার অনেক অধ্যাপক লিখেছেন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী না শিখিয়ে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করলে অর্থনৈতিক অপচয় ঘটবে। "An expert language planner, however aims at maximum achievement in minimum time for as little expenditure as possible. What our planner does not seem to realise is that to introduce English not earlier than the secondary stage will be *false economy* because a beginner at this stage will have to *work with a handicap.*"

কিন্তু দেশে expert language planner-রা ঠিক বিপরীত কথা বলেছেন। ১৯৫৭-এ ভারত সরকার B. G. Kher-এর নেতৃত্বে যে report of the official language commisson গঠন করেছিলেন, সেখানে বলা হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং ধারা অনুযায়ী নিঃশুল্ক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা অপচয় ছাড়া কিছু নয়।

"So far the child undergoing free and compulsory elementory education in terms of Article 45 of the constitution is concerned *it would be waste* to make him

undergo any instruction in the English language." Dr. V. K. Gokak-এর নেতৃত্বে study group on the study of English অভিমত দিয়েছেন, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা শেখাতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ বিপুল। এর চেয়ে উচ্চপ্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করলে তা দেশের পক্ষে সহজসাধ্য। "The amount of money and the number of trained teachers required to make the teaching of English possible from class III upwards would indeed be colossal. It is more easily managable from economic and administrative point of view to attempt a reform in the teaching of English from the upper primary or middle school level than from the lower primary level" আর কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর Dr. D. P. Pattanayak বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা খুবই খরচ সাপেক্ষ এবং গুরুভার হয়ে দাঁড়াবে। তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বহনে সক্ষম নয়। এমন কি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় একটিমাত্র ভাষাই শেখানো হয়। "The learning of additional languages is *a costly and difficult load* which the education system is ill-equipped to bear. Even in the industrially advanced country the whole course of primary education used to be based on the study of one language only."

ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের দিক থেকে

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে সন্তানকে শুরু থেকে ইংরেজী শেখাবার পিতামাতার ঝোঁক বিচার করে দেখা যেতে পারে। লক্ষণীয় কোন্ স্তরের অভিভাবক কোন্ মানসিকতা থেকে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়াতে শিশুটিকে পাঠাচ্ছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পিতার মধ্যে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মায়েদের মধ্যে এই ঝোঁক প্রবল। তাদের বিত্ত কম, শিক্ষা আছে। তাদের চিন্তা এরকম,—বড়ো কঠিন সময় যাচ্ছে, চাকরির বাজারে দারুণ প্রতিযোগিতা, সন্তানকে কী করে দাঁড় করানো যাবে? তারা মনে করেন কষ্টে-সৃষ্টে ছেলেটিকে যদি ইংরেজী শিখিয়ে চটপটে করে দাঁড় করানো যায়, তবে হয়তো ভালো চাকুরি পেতে পারবে। এরকম পরিবারে দুটি সন্তানের মধ্যে যদি একটি মেয়ে হয়, এবং দুটিকেই ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে সঙ্গতির অভাবে

পাঠানো সম্ভব না হয়, মা ছেলেটিকে ইংরেজী পড়তে পাঠাবেন। আরেক অংশ অভিভাবক আছেন যাদের বিত্ত আছে, কিন্তু পরিবারে পড়াশোনার চর্চা নেই, ইংরেজী জানেন না, সেজন্য পিতামাতার মনে হীনমন্যতা ও ক্ষোভ রয়েছে। তারা সন্তানকে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে শুরু থেকে ইংরেজী পড়াতে পাঠিয়ে অবচেতন মনের ক্ষোভের প্রতিশোধ নিচ্ছেন, হীনমন্যতা দূর করতে চাইছেন। আর সন্তানকে দিয়ে সামাজিক পদমর্যাদায় উঠতে চাইছেন। প্রতিবেশীর ঈর্ষা কুড়িয়ে আত্মপ্রসাদ বোধ করছেন।

তৃতীয় এক স্তরের অভিভাবক আছেন যাদের বিত্ত পর্যাপ্ত, ডিগ্রী আছে, সামাজিক পদমর্যাদা দু'এক পুরুষের, তারা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় সম্পর্কে উন্নাসিক। ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে নিজে পড়েছেন, স্ত্রী পড়েছেন, সন্তানকে না পাঠালে সামাজিক মর্যাদা থাকে না। সন্তানকে উপযুক্ত চাকুরিতে, ব্যবসায় বসিয়ে দেওয়াটা এদের ভাবনা নয়, তাকে তার উপযুক্ত করাটাই চিন্তা।

সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের একাংশ আছেন, যারা শোনেন, দেখেন যে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, মানবৃদ্ধির চেষ্টা মনঃপুত নয়। ভালো দু'একটি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে বহু চেষ্টা করেও সন্তানকে ভর্তি করা গেল না, অথচ সন্তানটিকে নিয়ে স্বপ্ন আছে, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা আছে। সুতরাং অর্থকষ্টে ভুগেও সন্তানকে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, বালিগঞ্জ গভঃ স্কুল, বেথুন, সাখাওয়াত, রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল পেলে এইসব অভিভাবক সন্তানকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না।

আরো নানান সূক্ষ্ম স্থূল চিন্তা থেকে অভিভাবক সন্তান পাঠাচ্ছেন। কিন্তু সর্বত্রই শিশুরা অভিভাবকের আবেগ, অভ্যাস, স্বার্থচিন্তার বলিতে পরিণত হচ্ছে। শিশুর মুখে ইংরেজী ছড়া শুনে, শিশুর হাতে একাধিক ইংরেজী বই, ইংরেজীতে লেখা অঙ্ক, ইতিহাস বই দেখে, খাতায় খাতায় বাড়ির কাজ দেখে অভিভাবক যখন তৃপ্তি বোধ করেন, সন্তানের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সফল হতে চলছে বলে স্বস্তি পান, সামাজিক পদমর্যাদার সিঁড়িতে দর্পিত ভঙ্গীতে দাঁড়ান, তখন কিন্তু শিশুর দেহমনে হয়তো প্রতিবৃত্ত চক্র সৃষ্টি হয়েছে—একথা তারা ভাবতেও আঁৎকে উঠবেন। কিন্তু বিজ্ঞান তো পিতামাতার উন্নাসিকতা, অবৈজ্ঞানিক ইচ্ছা বা অজ্ঞাত অজুহাতে তার গতিকে ভিন্নমুখী করবে না। বস্তুতঃ প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শিক্ষার সম্ভাব্য ক্ষতি সম্বন্ধে পিতামাতার অজ্ঞতা এই উদগ্র ঝোঁকের পেছনে কাজ করে। অপরপক্ষে অজ্ঞতার অন্ধকার পথে

পথেই ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় চালাও ব্যবসা খুলে চলেছে। অজ্ঞ অভিভাবক বাসনার তাড়নায় সে ফাঁদে নিজেরা ধরা পড়ছেন এবং ফাঁদের বিষে নিরীহ ও অভিভাবকবশ স্নেহের পুত্তলির দেহ-মনের বিকাশ ব্যাহত করছেন। সম্প্রতি মফকুম্বা শহরের সীমা ছাড়িয়েও বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবসার ঝাঁপ খোলা হচ্ছে। এবং সন্তান হাতে ও কোলে নিয়ে অভিভাবক ফাঁদে পড়তে ভিড় করছেন। তবে এমন নজির আমার জানা আছে, অভিভাবক যেখানে প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শিক্ষার কুফল সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে উদগ্রীব হচ্ছেন।

আরেক ধরণের অজ্ঞতা থেকে অভিভাবক ভাবেন, শুরু থেকে ইংরজী শেখালে সন্তানের চাকুরীর যোগ্যতা বাড়বে। এই চিন্তার ফলে সন্তানের জীবনে এবং পরিবারের স্নেহ-প্রেমের ভূমিতে বহু ক্ষেত্রে দুর্দৈব ঘটে গেছে। এক্ষেত্রে প্রথম অজ্ঞতা হল, তারা দেখে শুনেও বুঝতে চান না যে আমার দেশের চাকুরির সুযোগ ইংরেজী শেখা-না শেখার ওপর দাঁড়িয়ে নেই। চাকুরির সংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে কম। শিক্ষিত বেকারের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব বাড়ছে। এই অকরুণ মরুভূমিতে চাকুরীর যে মরুদ্যানটুকু দেখা যায় সেখানে তাঁবু ফেলার দাবিদারের সংখ্যা এত বেশি, এবং সেখানে সুঁড়ি পথ এতো অন্ধকার যে প্রতিযোগিতায় সফলতা ও চাকুরিলাভের সুনিশ্চয়তা কোনো ইংরেজী বিদ্যালয় দিতে সাহসী হবে না। যদি শিক্ষার শুরু থেকে ইংরেজী শিখলে এই মরু পার হওয়া যেত, তাহলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সন্তানকুলে একজনও বেকার থাকত না। তবু পিতামাতার ক্ষীণ আশা ইংরেজীর ভিত পাকা হলে হয়তো চাকুরি লাভ সম্ভব হবে; যোগ্যতা তো তৈরী হলো। সেই যোগ্যতা ও সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হবে যদি প্রথম থেকে ইংরেজী না শিখে মাধ্যমিকে এসে বুড়ো খোকা A.B.C.D. পড়তে শুরু করে। এর উত্তর পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এবং যে-সব অভিভাবক আবেগ ও অভ্যাসকে যুক্তিতে শোধন করে নিয়েছেন, তাঁদের নজিরের কথাও উল্লেখ করেছি। তাঁরা সন্তানকে প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শিখিয়ে প্রতিবৃত্তচক্রে বলি দিতে চান না বলেই তুলে আনতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এই অজ্ঞতা বহু পরিবারে বিষবৃক্ষ রোপন করেছে। অশ্রুপাতে ও হাহাকারে বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করা যায় নি! ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির স্বচ্ছল ও অতি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানদের সংস্পর্শে এসে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের মধ্যে যে স্বভাব, বায়না তৈরি হয় অনেক পরিবারের বাস্তব অবস্থায় তার পূরণ সম্ভব

হয় না। ফলে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দিতে থাকে। অসহিষ্ণুতা, বদ্‌মেজাজ, দুর্ব্যবহার সন্তানের স্বভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মা শিউরে ওঠেন, আড়ালে অশ্রুপাত করেন। সন্তানকে কেন্দ্র করে পিতামাতার দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ সন্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এরকম একটি বিদ্যালয়ের কথা জানি যেখানে শিক্ষক-দিবসে ম্যাডামদের দামী উপহার দিতে না পারায় পিতা-পুত্র-স্ত্রীতে অতি কদর্য বিবাদ ঘটেছে। পর্যাপ্ত খাতার যোগান দিতে, পোষাকের পরিমাণগত ও গুণগত মান রক্ষা করতে, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নানা ব্যয়সাধ্য নির্দেশ পালন করতে অক্ষম হওয়ায় শিশু সঙ্কুচিত, লজ্জিত, পীড়িত হয়ে উঠছে। এসবই তিল তিল করে তার বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তাকে শ্রদ্ধাহীনতায়, অসন্তোষে, হীনমন্যতায় পিছু টানছে। তার প্রভাব পড়ছে পরিবারের শান্তিতে। মায়ের মনোগত ইচ্ছা ও আর্থিক বাস্তবতার দুই প্রান্ত মিলছে না। এত বড়ো ব্যয়সাধ্য লগ্নীটা পরিবারের দিক থেকে, সন্তানের ভবিষ্যতের দিক থেকে লোকসানে গেল। গোটা পরিবার ট্রাজেডী-অব-এরর্‌-এর হাহাকারে গুমরে উঠছে।

উঁচুদরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের ঝাড়াই নীতি লক্ষণীয়। বাসনাতাড়িত উন্মত্ত অভিভাবকদের আশ্বস্ত করে শত শত শিশু ভর্তি করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে এই ছড়ানো জালখানা গুটিয়ে আনা হয়। সেই সঙ্কর্ষণ পদ্ধতিতে শিশু ছাঁটাই হতে থাকে। ছাঁটাই সন্তানকে কোথায় ভর্তি করা যাবে? পিতামাতার স্বপ্ন, অভ্যাস, আবেগ বাংলা-স্কুল মেটাতে পারে না। ভালো বাংলা স্কুলে ছাঁটাই সন্তানকে ভর্তির সুযোগও পাওয়া যায় না। অভিভাবকের এই অবস্থা সুযোগ নিয়ে ঝাঁপ খুলেছে বহু দ্বিতীয়, তৃতীয় দরের ইংরেজী বিদ্যালয়। স্কুল ব্যবসায়ে, দুই ভাষা শিক্ষা ব্যবসায়ে, শিশু ব্যবসায়ে, এরা এক নতুন ব্যবসা-পথ তৈরি করেছে। আশাহত পিতা, বিমর্ষ মা ছাঁটাই সন্তান হাতে ধরে এতদিনের অভ্যস্ত পথ ছেড়ে নতুন পথে নতুন এক ইংরেজী বিদ্যালয়ে চলে। শিশু তার নিষ্পাপ চোখ তুলে বলে—'মা, আমার ঐ স্কুল?' মা হ্যাঁচকা টানে টেনে নিয়ে চলতে চলতে বলে 'আরো ভালো স্কুলে বাবা তোমাকে ভর্তি করে দিয়েছে।' এই সঙ্গোপন প্রতারণা একদিন শিশু ধরে ফেলে! সন্তান ও পরিবারের মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়ে যায়।

এতো সব জেনেও যারা প্রাথমিক স্তরে দুই ভাষা শেখাবার জন্য যে-কোনো মূল্যে আন্দোলনে নেমেছেন, তাদের মানসিকতা কোন্‌ ধরণের? কলকাতায় এবং উপকণ্ঠে বহু বাংলা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা/প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে

অভিভাবকদের স্বাক্ষর গ্রহণ চলছে। ইংরেজী রাখতে পিতা-মাতা অসম্মত হলে, শিশু সন্তানের ওপর কর্তাব্যক্তিদের রোষ পড়বে। অনেক স্কুল শিক্ষকরাও এই স্বাক্ষর সংগ্রহে রত। এরা ইংরাজী বিদ্যালয়ের পক্ষে নন, কিন্তু বাংলা বিদ্যালয়কে দুই ভাষা শিক্ষার অবশ্য কেন্দ্র করতে অবতীর্ণ।

উদ্দেশ্য ব্যতীত কর্ম হয় না। এদের একাংশের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং তা স্পষ্ট। কিন্তু কোনো কোনো অংশের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের নীচতায় ক্লীন্ন। সামাজিক দায়িত্ববোধহীনতায় নিন্দনীয়।

ওয়াকিবহাল হয়ে আতঙ্কিত হলাম যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী উঠে গেলে টিউশনের বাজার পড়ে যাবে এই ক্ষোভে, পুস্তক ব্যবসায় লাভের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এই ক্রোধে বহু শিক্ষক / শিক্ষিকা, প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকা স্বাক্ষর অভিযানের কর্মসূচী নিয়েছেন। এবং সেই স্বাক্ষররাশি দেখিয়ে মহাউদ্যমে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়াবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রের ক্ষতির শ্মশানে স্বার্থের ইমারত নির্মানে কোনো দ্বিধা নেই ; ছলনা আছে।

ঘাড় চেপে ধরে, কণ্ঠনালী বন্ধ করে উপকার করাবার এই মহাউদ্যোগ অভিনব। বড়ো বিচিত্র।

'মরে সুত জনকের দোষে।' সমাজের প্রাচীন প্রবাদ। মহাকাব্যিক প্রবাদ। বাপ যদি অজ্ঞ, অভ্যাস-আবেগতাড়িত হন পুত্রের অধিকতর সবনাশ। আর চিরকালই অজ্ঞলোককে শোষণ করে চালাক লোকদের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ডঃ সমরেন্দ্র কুমার জানা

আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ শিক্ষা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে মানুষ অনেক বেশী চিন্তা করতে চাইছেন, ভাবতে চাইছেন, এবং সঠিক প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে গভীরে মনোনিবেশ করছেন এটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। বিশেষ করে তাঁদাকে কেন্দ্র করে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মনোজগতে এই অবস্থাটাই পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটাবে এটা সুনিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। এই চিন্তা-ভাবনা শিক্ষার অগ্রগতি ঘটানোর সহায়ক শক্তি হিসেবে ক্রমশ বেশী বেশী করে প্রকট হয়ে উঠবে। যাঁরা মানুষের এই সুস্থ ভাবনা চিন্তার বিরোধিতায় এগিয়ে এসেছেন তাঁরা বেশ কিছুটা পরাজিত হয়েছেন। আরও হবেন যখন আমরা মনীষীদের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে ক্রমশ বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিতে পারব।

ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের আলোক বর্তিকার উজ্জ্বল প্রভায় সমগ্র দেশকে আলোকিত করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশ শাসকেরা ইংরেজী-শিক্ষা তথা উচ্চতর শিক্ষা এদেশে প্রবর্তন করেনি। শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলকে সুদৃঢ় করবার জন্য বিদেশী শাসকদের কিছু এদেশীয় সমর্থক প্রয়োজন ছিল। তাই তারা একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের (১৭৯৩ খৃঃ) দ্বারা জমির মালিকানা থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কিছু মানুষকে জমিদার তৈরি করেছিল, অন্যদিকে চাষীর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের জন্য শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছিল (১৮৩৫ খৃঃ)। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চেতনায় এদেশকে উদ্বুদ্ধ করা নয়, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এদেশের মানুষকে যুক্ত করা নয়, প্রতীচ্য সাহিত্য শিল্পকলার বিষয় ও আঙ্গিক কৌশলের দ্বারা দেশীয় সাহিত্য শিল্পকে সমৃদ্ধ করা নয়, কিম্বা এদেশে শিল্পোন্নতির জন্য জনশিক্ষা প্রসার নয়, কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য কর্মচারী, দোভাষী সৃষ্টি করাই ছিল তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এতো গেল ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার চেহারা।

ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ যে লড়াই শুরু করেছিল সেই লড়াইকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংগ্রামের যুগে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম চলছিল, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে শিক্ষার অধিকার রক্ষা, সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার দাবিও মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার দাবিগুলির অন্যতম ছিল মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করা এবং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় তিন যুগের মধ্যেও ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অবসান হলো না।

গণতান্ত্রিক শিক্ষার চেহারা কি তা বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মসূচীগুলিকে আলোচনা করলে বুঝা যাবে। বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন। শিক্ষার গণতান্ত্রিক রূপকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করবার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন শুধু নয়, তা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। গত একদশক ধরে পশ্চিমবাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছিল তা অপসারিত বললে বেশী বলা হবে না। শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ করে সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ অংশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে কার্যকরী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা, ক্রমবর্দ্ধমান হারে বিনা মূল্যে টিফিন ও পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের মাসান্তে বেতন পাওয়া সুনিশ্চিত করা, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য পে-কমিশনের রায়ের মাধ্যমে নজীরবিহীন নতুন বেতন হার, বাড়ীভাড়া, পেনশন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করা ইত্যাদি। আবার শিক্ষার মানোন্নয়নের কর্মসূচী অনুসারে শিক্ষাকে সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও অর্থবহ করে তোলার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করেছেন। শিক্ষাকে সর্বত্রগামী ও সহজে আয়ত্তাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন যে গোঁজামিল চলছিল তা দূর করে একটি

সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত ভাষানীতি গ্রহণ করেছেন। যার মূলকথা হলো প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভাষা হিসেবে কেবল মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা পড়বে, স্নাতক স্তরে ভাষা ও সাহিত্য পড়বে নির্বাচিত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী তিনটি 'ভাষা ও সাহিত্য' বিষয় নিয়ে স্নাতক হতে পারবে। এছাড়াও স্নাতক স্তরে সব শাখার জন্য একটি ভাষা আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ার সুযোগ থাকবে। এছাড়াও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বর্তমান রাজ্যসরকার শিক্ষার গণতান্ত্রিক রূপকে সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হোল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (সংশোধনী) আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন। একই নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন হয়েছে বা খসড়া নিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিতর্ক আলোচনা চলছে। সর্বত্রই নতুন আইন প্রণয়নে অথবা পুরনোর সম্মার্জনে একই মূল দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে—সকল সংস্থার প্রতিনিধিত্ব ব্যাপক করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে শিক্ষাজগতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাকে শক্তিশালী করা। নতুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব, ছাত্র ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের প্রাধান্য এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি হবেন নির্বাচিত—একই ভিত্তিতে সংগঠিত হবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন সংস্থা।

এই গণতান্ত্রিক শিক্ষার আলোকে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষা-চিন্তা আলোচনা করাই হবে এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। আলোচনা করার জন্য এই শিক্ষা-নায়কের 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান'; 'আমাদের উচ্চশিক্ষা'; 'মাতৃভাষা'; প্রবন্ধগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বিশ্লেষণে বিপুল অনুপাতে ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠে প্রতিটি পরীক্ষায়। কি বিপুল অপচয় আমাদের জাতীয় প্রয়াসের। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "আমার বোধ হয় সময় ও প্রয়াসের এই অপচয় এড়ানো সম্ভব, একমাত্র যদি আমরা আমাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা অপসারণের কাজে দৃঢ়ভাবে ব্রতী হই। কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি এনেছিলাম যে, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন

হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়েই ঠিকমত মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না যে, ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কি না। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা যোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।"

[শিক্ষা ও বিজ্ঞান]

বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু নিঃসংশয় প্রকাশ করলেও বর্তমান রাজ্য সরকারের বৈজ্ঞানিক ভাষানীতির বিরোধিতায় প্রমথনাথ বিশী, ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, মনোজ বসু, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখেরা যাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন এঁরা এই বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা না শিখালে ছোট ছোট ছেলেদের ভবিষ্যৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। [আনন্দবাজার পত্রিকা— ২৫ শে জানুয়ারী '৮১ র 'ভ্রান্ত' শিক্ষানীতি রুখতে বৃহত্তর আন্দোলন শীর্ষক অংশটি দ্রষ্টব্য।]

বৈজ্ঞানিক ভাষানীতি তথা শিক্ষানীতির বিরোধীদের অন্যতম শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর লেখা 'সাহিত্যে সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ [১৯৮১র ১২ই ডিসেম্বর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত] থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরলাম। প্রমথবাবু লিখেছেন, "প্রাথমিক স্তরে প্রথমাদিকে ইংরেজী ভাষা বাদ পড়েছে। কেন বাদ পড়ল তার কারণ দর্শাতে গিয়ে বামফ্রন্টের 'বিশেষজ্ঞগণ' বলেছেন যে এক সংগে বাংলা ও ইংরেজী পড়তে গেলে ছাত্রদের মেধার উপর চাপ পড়ে। ওটা উচিত নয়। বামফ্রন্ট সরকার কখনো বিশেষজ্ঞগণের নাম প্রকাশ করেন না। আমরা যথা সময়ে বিস্তারিত ভাবে আমাদের বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য প্রকাশ করব। এখন শুধু নামগুলি প্রকাশ করছি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বারট্রাণ্ড রাসেল"। প্রমথবাবু বামফ্রন্টের বিশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা পান নি বলে বামফ্রন্ট সরকারের বৈজ্ঞানিক

ভাষানীতি ও শিক্ষানীতিকে মেনে নিতে পারছেন না—আমার বক্তব্য বামফ্রন্টের বিশেষজ্ঞগণের নামের তালিকা নাইবা পেলেন, স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপরিউক্ত বক্তব্য পড়ুন, পড়লে মনে হয় এই ধরণের বিরোধিতা করতে চাইবেন না। এর পরেও যদি করতে চান তাহলে বলতে হবে বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থে একাজ করতে চাইছেন। যে শ্রেণীর জন্য একাজ করতে চাইছেন তাঁরা সংখ্যায় কম। আর মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ বসু যাঁদের জন্য বৈজ্ঞানিক ভাষানীতি ও শিক্ষানীতির প্রয়োগ সম্পর্কে অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমাদের সামনে রেখে গেছেন, যা আজকের পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তাঁর শিক্ষানীতির মাধ্যমে সেই বাস্তব চিন্তা ভাবনা ও প্রয়োগ বিধিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং আরও ভবিষ্যতে লাগাবেন তাঁরা শ্রেণীগতভাবে সংখ্যায় অনেক বেশী। তাই প্রথমবাবুদের মত বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে বলি, এমন কি স্বার্থ আপনাদের রয়েছে যার জন্যে আপনারা বেশী সংখ্যক মানুষের উপকারের কথা চিন্তা না করে কম সংখ্যক মানুষের উপকারের কথা চিন্তা করে সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছেন? তবে সুস্পষ্ট ভাষায় বলি, এই ভাবে সমাজের অগ্রগতি ঠেকাতে পারবেন না কারণ অনেক মানুষকে অনেকদিন ধরে বোকা বানানো যায় না—এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটা মনে রাখবেন।

এছাড়া আরও বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুনীতিকুমার প্রভৃতি যে সমস্ত মনীষীদের নামোল্লেখ করে আপনাদের বিশেষজ্ঞ বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন তাতে মনে হয়েছে এরা যেন আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়েছেন। এটা কি ঠিক? না। কারণ এই সমস্ত মনীষীরা জাতির সম্পদ ও জাতির বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া এই সমস্ত মনীষীদের বক্তব্যকে চতুরতার সংগে আড়াল করে কেবল মাত্র নাম দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে গিয়ে দেশের মানুষের সামনে কতবড় অপরাধ করেছেন তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? যে সমস্ত মনীষীদের নামোল্লেখ করেছেন আমি তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করে এবং তাঁদের বক্তব্যকে তুলে ধরে আপনি যে ঠিক কাজ করেন নি তা প্রমাণ করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যা বিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজী। বিদেশী জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটিতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা

মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।" (শিক্ষার বাহন / সংকলন)

রবীন্দ্রনাথ একেবারে গোড়া ধরে টেনেছেন। শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, উচ্চ শিক্ষার উচ্চতর সোপানেও মাতৃভাষার যষ্ঠী অবলম্বন করা হোক এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। "আমাদের ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। ভরসা করিয়া এইটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছিল।" (শিক্ষার বাহন)

রবীন্দনাথের বক্তব্য এইভাবে অনেক তুলে ধরতে পারি, তবে এই দুটো বক্তব্য মনে হয় এখানে যথেষ্ট। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ভাষা শিক্ষার অনেক বই লিখেছেন। ইংরাজী শিক্ষার বই লিখেছেন। সে বই-এর ভূমিকাতে লেখা আছে, আমাদের দেশের ছেলেরা বেশী বয়সেই ইংরাজী শিখবে।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনকে যে মাইনরিটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন স্কুলে ছ' বছর ইংরাজী শেখাতে হবে। এই বক্তব্যগুলি প্রমথ বাবুর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করছে নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আর একটি কথা বলতে চাই, প্রমথ বাবু বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তাঁর বিশেষজ্ঞের তালিকায় রাখেন নি, কিন্তু আমরা পশ্চিমবাংলার অগণিত মানুষ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গণতান্ত্রিক শিক্ষা চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করব এ প্রতিজ্ঞা করছি। আর যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের শিক্ষা চিন্তা যে আমাদের শিক্ষা চিন্তা, তা বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়নের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

আমদের দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরাজীতে বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা করে কিভাবে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষকে অজ্ঞ করে রেখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্যের মধ্যে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেখানে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ানো হচ্ছে জাপানী ভাষায় আর তারই পাশাপাশি জাপানী ছাত্রেরা চালাচ্ছেন বহু দুঃসাহসী ও অভিনব গবেষণা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়। নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার করা শব্দ (Loan word) ব্যবহার করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু-জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরাজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তর্জমা হয়েছে। আবার জানানো হল এই বইটি বেশ ভালোই বিক্রী হয়েছে ছয় মাসে, প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমানবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশী বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবুও আমাদের দেশে ওই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরাজীতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীদের শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে।" তিনি আরও যা বলেছেন তার মূল কথা হ'ল যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয় তাঁরা বাংলাও জানেন না, বিজ্ঞানও জানেন না। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই বক্তব্যগুলি তাঁর গণতান্ত্রিক শিক্ষা চিন্তার কথাই প্রকাশ করে। বিজ্ঞান শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে তা না হলে দেশের মানুষের কাছে অপরাধী হতে হবে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলাফলও যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথের উপরিউক্ত বক্তব্য পড়লে ও অনুধাবন করলে দেখা যায় বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ও ভাষানীতিতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তায় চিন্তিত হতে চাইছেন।

'আমাদের উচ্চশিক্ষা' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "বিদেশী ভাষায় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে জনসাধারণের সমর্থন এবং তাদের হৃদয়ে স্থান পেতে হলে হৃদয় নিঃসৃত রক্ত দিয়েই তা হবে ; লিখতে হবে মাতৃভাষায়, অন্তরের অন্তস্থলে যার উৎস, যা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের পরিপোষক। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের নীতি যদি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করতেন, তবে এই প্রাচীন দেশে নব যুগের অভ্যুদয়ের স্বপ্ন অনেক আগেই সফল হত।" বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই উক্তি করেছিলেন ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে অথচ ১৯৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারীর আনন্দ বাজার পত্রিকা

('ভ্রান্ত' শিক্ষানীতি রুখতে বৃহত্তর আন্দোলন শীর্ষক অংশ) দেখুন দেখবেন আচার্য সুকুমার সেন তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেছিলেন, "ইংরাজী ভাষা সব দেশের পক্ষে মানুষ হবার অবশ্য মাধ্যম। এ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অন্যায়।" অধ্যাপক প্রমথ বিশী ঐ একই সভায় বলেছিলেন, "আমরা যদি ইংরাজীকে ভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে বারো আনা সমস্যার সুরাহা হয়ে যেত। কিন্তু এই বৃথা আত্মাভিমান বর্জন করা যাচ্ছেনা, তাই দেশ আজ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে।" আজকের দিনের সমাজ সচেতন মানুষ যখন এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তির বক্তব্য পড়বেন আর যখন শিক্ষানায়ক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তাধারার সম্মুখীন হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও ভাষানীতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন তখন কি একথা তাঁরা ভাববেন না যে এঁরা ইচ্ছে করে সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝাতে চাইছেন? এঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি সাধারণ মানুষ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবেন না? তাঁরা কি একথা ভাববেন না যে এঁরা কেন সত্যের অপলাপ করে মোহজাল বিস্তার করতে চাইছেন?

শ্রীবসু এই ভাষণে আরও বলেছেন, "আমি চিরদিনই গতানুগতিক পথে চলার মনোভাবকে অবিবেচনার কাজ বলে প্রতিবাদ করে থাকি। বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাঁদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটাতে বাধার সৃষ্টি হয়।"

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই গণতান্ত্রিক শিক্ষার-চিন্তাধারার সংগে বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির ব্যাপক মিল রয়েছে। কারণ বর্তমান রাজ্য সরকার পশ্চিম বাংলার অগণিত মানুষকে নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে সাক্ষরতার আলোতে নিয়ে আসার জন্য প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাধ্যতা মূলক অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিলোপ সাধন করেছেন তাঁদের ঘোষিত শিক্ষানীতির মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তকে পশ্চিম বাংলার আপামর জনসাধারণ মেনে নিয়েছেন। মেনে নিতে পারেন নি তাঁরাই যাঁরা কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের হাঁক-ডাক কিছুটা স্তিমিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু রেশ থেকে গেছে একথা ভুললে চলবেনা।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু কিভাবে দেশের অগণিত মানুষকে শিক্ষার আলোকে আনতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এই প্রবন্ধের শেষ কয়েকটা পঙক্তিতে রয়েছে। "এখন সময় এসেছে। আর বিলম্ব না করে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সকল

বিষয়ের শিক্ষা দিতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে। পঞ্চাশ বছরেরও আগে আমাদের চিন্তানায়কদের নিকট এটি সম্ভবপর প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিল। এখন মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ও আইন সভার সভ্যদের বিশেষরূপে বিবেচনা করে দেখতে হবে।"

আজকে পৃথিবীতে প্রমাণিত হয়েছে সব থেকে বড় সম্পদ, মূল্যবান সম্পদ হল মানব সম্পদ। ক্যাপিটাল নয়, পুঁজি নয়, সব থেকে গতিশীল সম্পদ হল মানব সম্পদ। শুধুমাত্র পুঁজি কোন দেশের অগ্রগতি আনতে পারে না। তা যদি হয় তাহলে দেশের অগণিত মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অগণিত মানুষকে শিক্ষিত করতে গেলে শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে এবং শিক্ষার গণতান্ত্রিক রূপকে বিকশিত করতে হবে। শিক্ষার গণতান্ত্রিক কাঠামো তখনই সবল হবে যখন শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠবে মাতৃভাষা। শুধু তাই নয়, মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে। সে বলবে না আমি অসহায়, চাকরি না পেলে আত্মহত্যা করবো। সে তখন বলবে আমাদের লক্ষ কোটি শিক্ষিত মানুষের মুখে যে আশা সঞ্চারিত হয়েছে, নতুন রুচি সঞ্চারিত হয়েছে, তাতে আঘাত দেবার ক্ষমতা আর এ সমাজের নেই কিন্তু এ সমাজের অভ্যন্তরে আগামী দিনের সুন্দর সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত আছে। সে উপাদানকে এতদিন ব্যবহার করা হয়নি। এসো আমরা সুশিক্ষিত জনগণ আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করি, সমাজকে পরিবর্তন করি এবং সমাজের সঞ্চিত মানব সম্পদগুলিকে অগ্রগতির স্বার্থে ব্যবহার করি, প্রতিটি মানুষের জন্য সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলি। শিক্ষার গণতান্ত্রিক কাঠামোর কথা মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধে অত্যন্ত সঠিকভাবে লিখেছেন, "এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে, এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে।"

ভারতবর্ষ একটি বহু ভাষা-ভাষীক রাষ্ট্র। এখানে আন্তরাজ্য যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও জাতীয় সংহতির প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী। যদিও গ্লানিকর তবু বলতে হয় যে, এখনো কোন ভারতীয় ভাষা এই ব্যাপারে ইংরেজীর বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত

হতে পারে নি। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন আমরা এখনই "ইংরাজী হঠাও" শ্লোগান তুলে জেহাদ ঘোষণা করছি। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের দাবী অবিলম্বে দেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্বাধীন ও সুসম বিকাশের মধ্য দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে ইংরাজীর বিকল্প হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই সঙ্গে আমরা এও চাই যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার স্বাধীন ও সুস্থ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংযোগ ও সংহতি গড়ে উঠুক। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ইংরাজীকে সংযোগকারী একটি ভাষা হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু সর্বস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম, সুতরাং ইংরাজীর স্থান হবে দ্বিতীয়। অবশ্য ইংরাজী ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণের জন্য জাতীয় স্বার্থে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে ইংরেজী ভাষা না হলে আমাদের দেশের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে। এই উপলক্ষ্যে 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"অনেক সময় এই কথাটাই বলা হয় যে ইংরেজী ভাষা না হলে আমাদের দেশে একতা থাকবে না। বলা হয়, আমরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল দিয়ে একত্র বাঁধা ছিলাম তখনই আমাদের মনে ছিল যে, আমরা একই জাতি। অতএব বর্তমানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই সেই যোগসূত্র বজায় রাখা হোক। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে যে, ওই শৃঙ্খল পড়াবার আগে আমাদের জাতীয়তা বোধ ছিল না।" এই প্রবন্ধের আর এক জায়গায় বলেছেন, "একটি বিদেশী ভাষা, একটি বিদেশী শাসন, আমরা অনেকদিন সহ্য করেছি। যদি এর দ্বারাই ঐক্য সাধন হোতো, সে ঐক্য সাধন এতদিনে হওয়া উচিত ছিল।" জাতীয় সংহতি প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য কত সঠিক নিম্নোক্ত বক্তব্য সেকথা প্রমাণ করবে। তিনি 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' শীর্ষক অংশে বলেছেন, "কেবলমাত্র বিদ্যার্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশ মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক।" ভাষা ও জাতীয় সংহতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত কত সুস্পষ্ট তা উপরের আলোচনা থেকে অনুমেয়।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও ইতিহাস পাঠ

শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

মানব ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ, আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবেগ প্রক্রিয়ান্বিত হওয়া এক জিনিস নয়। প্রথমটির সঙ্গে মানবিক ও সামাজিক উপাদানের সহ-সম্পর্ক ও সমন্বয় প্রক্রিয়া যুক্ত করে, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে এক ধরণের অহং-মানসিকতা বা বিচ্ছিন্নতাবোধ যুক্ত করে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুল ইত্যাদিতে পড়া যাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী 'এলিট' শ্রেণী বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এদেশে বিটিশ শিক্ষার কাঠামোয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের 'তোতা-কাহিনী'র কুশীলব বলেছেন। এই ভাবেই প্রচলিত প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে একটি শিশু বড় হয়ে একজন 'জাতীয়তাবাদী' হতে পারে, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন বা প্রাণীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে পারে, অথবা একজন ধর্মপ্রাণ নীতিবাগীশ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হওয়া অন্য জিনিস।

শিক্ষা বা সংস্কৃতির অধিকার অর্জনের ঘটনা অনেকটা মানবদেহের স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মতই ঘটনা। কোন একটা বিশেষ অঙ্গের পেশী স্ফীত বা জোরালো হলেই যেমন সুদেহী বা স্বাস্থ্যবান পুরুষ বলা যাবে না, তেমনি 'আমি রসায়নবিদ্ বা পদার্থবিদ—সঙ্গীতে রুচি নেই' অথবা 'আমি ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হতে পারি, সৌরবিজ্ঞানে বা নাট্যকলায় আকর্ষণ বোধ করি না'—এরকম যারা বলেন বা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ছাঁচ যাঁদের দিয়ে এই রকম কথা বলায়, নিঃসন্দেহে তাঁদের শিক্ষা বস্তুত, মানবব্যক্তিত্বের গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ। প্রকৃত শিক্ষা কখনই যা-কিছু মানবিক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তবে এখানেও একটা বিষয় বিবেচনার আছে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ আনাতোলি লুনাচারস্কি 'অন এডুকেশন' গ্রন্থে যা বলেছেন তার সারাংশ হল: একজন শিক্ষিত নাগরিক হওয়া মানে শুধুই কোন বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ হওয়া নয়, সেই সঙ্গে তাকে সামাজিক ঐতিহ্য, মানব সভ্যতার বিকাশে মানবিক শক্তিগুলির অবদান, সমকালের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে অনুভূতিশীল ও চেতনা সম্পন্ন মানুষও হয়ে উঠতে হবে, বিশেষ ও সাধারণের সম্মিলনে যে ঐকতান তার প্রতিটি এবং

সামগ্রিক সুর সম্পর্কে আগ্রহী ও স্পর্শকাতর হতে হবে। তবেই সেই দক্ষতা ও চেতনাসঞ্চারী শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। যুগে যুগে মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলিকে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নততর মানবিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার একটি আদর্শ পাঠক্রমের অর্থই হল, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রক্রিয়ার স্তরে স্তরে কার্যকর সহযোগিতা দেওয়া এবং সমাজ বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গঠন-ক্রিয়াকে এমনভাবে যুক্ত করা যাতে শিক্ষার্থী সমাজের পশ্চাৎপদতার উপাদানগুলিকে বর্জন করতে শেখে এবং তার অর্জনের কোথায় যেন বস্তুসম্পদ নির্মাণের ও মানবিক মূল্যবোধগুলির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এখানেই ব্যক্তিত্বের গঠনে পরিবেশ ও ইতিহাস-সচেতনতার গুরুত্ব।

যখন বলি, সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে বোধের বিকাশ—তখন অতীত ও বর্তমান দেশ ও বিশ্বের ধারণা যুক্ত থাকে। অথবা যখন বলি মানুষের বস্তুব সাফল্য, যা শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান, তখন উৎপাদনশীল শ্রমের এবং সৃজনশীল মানবিক অনুভূতির মূল্য ও ইতিহাস সঞ্চালনের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি থেকে পর্যায়ক্রমিক বিকাশের মধ্যে সত্য বলে গ্রহণ না করা অগণতান্ত্রিক ও অবৈজ্ঞানিক।

আমাদের দেশের সংবিধানে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার কথা এবং কমিশনের সুপারিশে, সাবজনীন উৎপাদনশীল শিক্ষার কথা বড় গলায় বলা হলেও এযাবৎ একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর হল না। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোট আছে, সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এখানে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার কোন কর্মসূচী নেই, যার ফলে 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ' এ আজ বিপুল শ্রমশক্তি অপচয়ের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ফলে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশ বৃহৎ পুঁজিপতি, জমিদার-জোতদার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মুনাফা মৃগয়ার মোক্ষম লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বোঝা যায়, এই সর্বগ্রাসী কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনেই বিগত দুই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রান্তিক কিছু রদবদল করে প্রধানত, সামাজিক ইতিহাসবোধবর্জিত উৎপাদনবিমুখ অবাস্তব 'প্যাকেজ-ডিল' পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু রাখা হয়েছে।

॥ ২ ॥

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষার কর্মসূচীতে স্বভাবত কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও ভারতের জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ (বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোঠারী কমিশন ও এন. সি. ই. আর. টি) এবং ইউনেস্কো প্রভৃতি সংস্থার স্বীকৃত নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে সেই ১৯৭৭ সাল থেকেই রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীকে গণশিক্ষার কাঠামোয় বিন্যাস করে বিজ্ঞান সম্মত ও বাস্তবমুখী পাঠক্রম রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই ঘটনায় ১৯৫০ সালের 'মূল এডুকেশন কমিটির' শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ভাবধারাও যেমন সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনি ১৯৭৭ সালের প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক ও বাস্তবমুখী করার উদ্দেশ্যে গঠিত 'প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি'র নানা সুপারিশও গৃহীত হয়েছে। তবু ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম এই কারণে :

১. শুধু নীতিগত স্বীকৃতি নয়, প্রয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

২. এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যের সংহতি সাধন।

৩. শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়োজনকে গতিশীল সমাজের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয়করণ।

৪. ছয় থেকে এগারো বছরের শিশুর, বিশেষ করে অবহেলিত দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর শিশুদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দান।

৫. সামাজিক প্রসঙ্গ ও যুক্তি নির্ভর জ্ঞানের সংযুক্তিকরণ।

বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা আরও বললাম এই কারণে, যেখানে এতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল না, সেখানে এই প্রথম সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবমুখী কর্মসূচীর রূপায়ণ সুরু হল।

প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ ৬—১১ বছর পর্যন্ত শিশুদের ইতিহাস পাঠের অপর নাম পরিবেশ বা সমাজ পরিচিতি।

কেন শেখানো হবে? সাধারণ উদ্দেশ্য হল :

১. উপযুক্ত নাগরিক করা।

২. গণতান্ত্রিক সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগানো।

৩. সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কু-সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনোভাব গড়া।

৪. নিজের দেহ ও পরিবেশ সম্পর্কে একটা মর্যাদাবোধ গড়া এবং সেইমত জীবন চর্চায় অভ্যস্ত করা।

এই স্তরে তারা জানবে, রোজকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামাজিক কাজগুলির সম্পর্ক। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যে মানুষের শ্রমশক্তির ভূমিকা কত মূল্যবান, সেটাও জানবে। সেই সঙ্গে জানবে পরশ্রমজীবী বা শ্রমবিমুখ অংশের জন্যই মানুষের এত দুঃখ ও অপমান।

শিশু-শিক্ষায় সমাজ বা ইতিহাস পরিচয়ের মধ্যে দেশ, বিশ্ব এবং সমাজ যে বদলায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি জাগানোর এবং প্রাকৃতিক ঘটনা ও সামাজিক বিষয়গুলির প্রতি বিজ্ঞানসিদ্ধ পর্যবেক্ষণী শক্তির গোড়াপত্তন করানোর ব্যবস্থাও থাকবে।

এই স্তরেই শিশুদের মধ্যে সবদাই একটা জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা হবে, আর মানব জাতির সভ্যতা বিকাশে শ্রমশীল মানুষের অবদান সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগানো হবে। এর সঙ্গে থাকবে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বপ্রেমের আলোকে দেশের প্রতি ভালবাসা জাগাতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, এই ইতিহাস-পাঠ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে এবং শিশুদের মধ্যে এর সঞ্চালনেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বন দাবি করে। সরকারী পর্যায়ে প্রস্তাবিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত পাঠ্যসূচীতে দেখা যায়, শিশু নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পারিবার-জীবন থেকে সুরু করে গ্রাম, পাড়া-পড়শী, কারখানা ঘর, খেলার মাঠ, হাট-বাজার, বিদ্যালয়, গ্রাম-শহরের বাড়ি ঘর, ফুলপাতা, পাখি, শহরের বাজারে কোথা থেকে কারা শাকসব্জি আনে, বিদ্যালয়ের পরিবেশে সংঘবদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার মূল্যবোধ—এইসব জানবে ও শিখবে।

তারা শিখবে পরিবারের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়। এর মধ্যে গড়ে উঠবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

তারা জানবে—এখন যে বাড়ী বা ঘরে তারা থাকে, সেগুলি কারা তৈরী করেছে, আগে মানুষ কি রকম ঘরে বাস করত, বাড়ি-ঘর তৈরীর জিনিসপত্র কোথা থেকে কিভাবে পাওয়া যায়। বাড়িতে বাগান, রোদ, হাওয়া ও বিশুদ্ধ পানীয় জল থাকার দরকার কেন, যাদের বাড়িঘর নেই তারা কিভাবে থাকে—এইসব।

এই স্তরের ইতিহাস পাঠে থাকবে পাড়া, গ্রাম, থানা, পোষ্ট-আফিস, পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা, রাজ্য দেশ সম্পর্কে সরল প্রাথমিক

ধারণা। শিশু জানবে তার পরিচিত মানুষজন কে কি কাজ করে, পাড়ার লোকেদের যৌথ কাজ ও উৎসবে যোগদান, পোশাক ও খাদ্য ব্যবহার ইত্যাদি।

শিশুর ইতিহাস বোধে আসবে গ্রাম-শহরের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা, খাল, নলকূপ, পাম্পসেট, যানবাহন, আলো ও ডাক-তারের ব্যবস্থা, চিকিৎসা, রেল-স্টেশন এইসব। সে আরও জানবে জমিতে কি কি ফসল হয়, জমি কাদের, কারা জমিতে কাজ করে, হাল-বলদ, সার। গ্রামে আর কি কি জিনিস কারা কিভাবে তৈরী করে, শহরের কারখানায় কারা কি কি জিনিস তৈরী করে। শিশু জানবে মানুষের সঙ্গে মুক্ত প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে পেয়েছে খাদ্য, পানীয়, কাঠের ও ধাতুর জিনিসপত্র, হাজার হাজার বছর ধরে আবিষ্কারের ফল হিসাবে পেয়েছে বিদ্যুৎ, রেডিও, রেলগাড়ি, আকাশযান, মোটরগাড়ি আরও কত জিনিস।

শিশু একটু বড় হয়ে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে শিখবে—সভ্য সমাজের অবদানগুলি, আর অর্জন করবে মানুষের সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে নতুন নতুন মূল্যবোধ।

এখন সে পড়বে মানুষের সভ্যতার গল্প: আদিম মানুষ—প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই, আগুনের আবিষ্কার, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান, পশুশিকার, পাথরের হাতিয়ার, ভাষার জন্ম, সবারই সমান কাজ সমান ভোগ।

এইভাবে পরপর সে জানবে পশুপালনের যুগ গোষ্ঠী জীবনের যুগ, মিশর, সিন্ধু, চীন সভ্যতার গল্প, লোহা আবিষ্কারের ফলে নতুন যুগের গল্প, কৃষি-ধাতু-লিপির যুগ, সবাই সমানের যুগ থেকে দাস শ্রমের যুগে আসা।

এইবার সে জানবে ভূমিরাজ ও ভূমিদাসের কাহিনী। সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে কুটির শিল্পের পাশে পাশে কিভাবে ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠছে, তা-ও জানবে এবং তার ইতিহাস জ্ঞানের পরিমণ্ডলে আসবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, গোষ্ঠী থেকে বড় রাজ্য, রাজ্য দখল, জমি, খনি ও রাজ্য দখলের জন্য গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ, ভারতে পারসিক অভিযান, তুর্কি ও আফগান অভিযান।

এরই পাশাপাশি সে শিখবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অস্পৃশ্যতা কাকে বলে এবং তার বিরুদ্ধে নানক, কবীর, যীশু, বুদ্ধ, মহাবীর ও হজরত মহম্মদের প্রচার, সে জানবে নালন্দা ও তক্ষশীলার কথা, অজন্তা-এলোরা ও তাজমহলের কথা এবং বেদ কোরাণ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম-সাহিত্যের কাহিনী।

শিশু এরপর পঞ্চম শ্রেণীতে জানবে :

১. ভৌগোলিক আবিষ্কারের সঙ্গে বাণিজ্যের এবং বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে উপনিবেশ গড়ার কাহিনী।

২. আধুনিক বিজ্ঞান, বাষ্প ও বিদ্যুতের সঙ্গে সহজতর ও উন্নত জীবনের সম্পর্ক।

৩. শিল্প কারখানার প্রসারে অসংখ্য শ্রমিক ও মুষ্টিমেয় মালিকের সম্পর্ক, শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের জীবন যাপনের পরিবেশ।

৪. আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন।

৫ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ।

৬. দেশে দেশে মানুষের আন্দোলন ও বিদ্রোহের কাহিনী।

৭. পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী।

৮. মনীষীদের জীবন ও কর্ম সাধনার কথা।

৯. সকল মানুষের সুখ শান্তির জন্য আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনা ও কাহিনী।

॥ ৩ ॥

এরপর শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরে আসবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম এবং নবম-দশম এক-একটি পর্যায় বলে ধরতে হবে।

শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী এক অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ধারা। মানব সভ্যতার অতীত ও বর্তমানের মত ব্যক্তি ও সমাজ এবং দেশ ও বিশ্ব ঠিক এমনই অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে এই ধারণাই বেরিয়ে আসে যে, ইতিহাস কেবল কতকগুলি তথ্য, নাম বা ঘটনার সমষ্টি নয়, তা হল, অগ্রগতির ধারা।

কিন্তু আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ ভারত থেকেই প্রচলিত ইতিহাস পাঠে শিক্ষার্থীদের মনে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ব্যক্তি-নায়কের প্রতি, রাজ-পরিবারের প্রতি মোহ বা উগ্র জাতীয়তার ঝোঁক দানা বাঁধে। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক শিক্ষার স্বার্থেই জেমস মিল, গোবিনো, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ঝোঁকের উপর তৈরী করেছিলেন এবং তারই অনুগামী কিছু প্রতিষ্ঠিত দেশীয় লেখক ইতিহাসের পাঠ্যসূচী ও পুস্তকগুলিকে একই ভাবে চালিয়ে গেছেন। এই ঘটনা বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক তো নয়ই, এমনকি গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানিক

কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক। এটা উপলব্ধি করেই কোঠারী কমিশন এবং এন. সি. ই. আর. টি মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীকে বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্গঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সেইমত সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন নির্দেশ করে। "Our national heritage can not be isolated from general human heritage. To talk of conflict between the two is a distortion of history." এর আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে ঘৃণ্য ফ্যাসীবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার ব্যাপক বিষক্রিয়া লক্ষ্য করে ইউনেস্কো ইতিহাস পাঠের অভ্যাস বদলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রচার করে বলে—"উগ্র জাত্যাভিমান, বর্ণবিদ্বেষ, ঔপনিবেশিক শোষণই বিশ্বযুদ্ধের কারণ। ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মনকে এগুলি থেকে মুক্ত করে বিশ্বনাগরিক গড়ে তুলতে হবে।"

এই পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যে নির্দেশিকা দিয়েছে, তার সঙ্গে ১৯৫৫-৫৬ সালে ডাঃ বিধান রায়ের আমলে গড়া ইতিহাস পাঠ্যসূচী কমিটির (যাতে অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরী প্রমুখ প্রথিতযশা ইতিহাসবিদগণ ছিলেন) দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গতিপূর্ণ।

"A major aim of teaching history in secondary schools of West Bengal should be to rouse a spirit of enquiry and creative thinking and to develop an understanding of human societies and civilisations by a critical appreciation of the past.

"Another aim should be to help the students develop a concept of social evolution, so that they may have an idea of historical continuity: the Past producing the Present, by stages of social change. (This aim conforms to the modern concept of history as a social science)".

পর্ষদ নির্দেশিত সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি সূত্রাকারে হল: বর্তমান কিভাবে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিত তার কার্য-কারণ জানা, বিভিন্ন যুগের বিবর্তন ও বৈচিত্র জানা, জাতিভেদবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র-জাতীয়তাবাদ থেকে চেতনা অর্জন, বৈচিত্র্যময় আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের জাতীয়

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য জানা, কিভাবে পুরাণ প্রথা-আচার ও ধ্যান-ধারণাগুলি নতুন মূল্যবোধের পথ ছেড়ে দিয়েছে তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিয়মগুলি জানা।

পরিশেষে উল্লেখ করবো, বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিও কিছু প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীকে উত্তেজিত করেছে। তাঁরা হিন্দু-মুসলমান-ব্রিটিশ যুগ, ভারতের রাজ-পরিবার ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বেশি করে পেতে চান এবং যথারীতি প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক পর্বভাগ, বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় ইতিহাস পাঠ, বিভিন্ন দেশের জনগণের চেতনা-বিকাশ ও বিপ্লব-বিদ্রোহের কাহিনী যতদূর সম্ভব বর্জনই করতে চান, এবং তাঁরা আদিম থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব জাতির ক্রমবিকাশে মানুষের শ্রমশক্তির ইতিহাস পড়াতেও নারাজ।

এই নিয়ে বিতর্ক উঠলে (১৯৫৫ ৫৬ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্রের আমলেও হয়েছিল) ১৯৮১ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারতসভা হলে এ বি. টি. এ আয়োজিত মহতী শিক্ষা-কনভেনসনে প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণীতে বর্ষিয়ান ঐতিহাসিক সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশোভন সরকার বলেছেন "৬, ৭, এবং ৮ ক্লাশের জন্য ইতিহাস বই করার জন্য যে সিলেবাস হয়েছে, তার ডাইরেক্‌সন ভালই হয়েছে। আমি তপন রায় চৌধুরী মিলে আমার বাড়ীতে বসেই এই রকম সিলেবাস করেছিলাম। এইভাবেই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন অধ্যায়ে ভাগ করে সাজিয়েছিলাম। এতেও দেখছি সঠিকভাবেই ভারতের সঙ্গে বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাস পাশাপাশি রয়েছে। ইতিহাসের সিলেবাস করার এই নীতিই ভাল।"

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭০ সাল থেকে সমস্ত মাধ্যমিক স্তরে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শুধু বাংলাদেশ, ৭ম—১০ম শ্রেণীতে শুধু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ানোর জন্য ডাঃ রায়ের আমলে সুশোভনবাবুর মত সুস্থমনস্ক বিদগ্ধ ইতিহাসবিদদের গড়া ইতিহাস পাঠক্রম বাতিল করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য: ব্যক্তি পূজা ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের ছাঁচে কাঁচা শিক্ষার্থীদের মনকে ঢালাই করা।

এ রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে শিক্ষা-সংস্কৃতির এই ধরণের ব্যাভিচার ও বিকারের অপসারণেও কার্যকর ব্যবস্থা করেছেন বলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের কায়েমী স্বার্থপুষ্ট কয়েকটি দলের এবং কতিপয় অবক্ষয়ী বুদ্ধিজীবীর নগ্ন বিকৃত চেহারা জনমানসে উন্মোচিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

বর্তমান সংকলনে "গণশিক্ষার স্বপক্ষে" অর্থাৎ ব্যাপক গণশিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য, সম্ভাব্যতা ও কার্যকরী পদক্ষেপ সম্বন্ধে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তারই পরিপূরক হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের কিছু বক্তব্য সংযোজিত হলো :

"আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫

"লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো তাদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে যে ভিত্তি গড়ে তুলেছে তা আমাদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।" গান্ধীজী : হিন্দী স্বরাজ

"আজকাল শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্বটা বেড়ে চলেছে।" গান্ধীজী : হরিজন বন্ধু

"সামন্ততান্ত্রিক ও অভিজাত সমাজ মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষার উপর জোর দেয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গণশিক্ষা এবং শিক্ষার সমান সুযোগের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।"

কোঠারী কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ৮৯

"ইতিহাসে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়, যেখানে ক্ষুদ্র একটি সামাজিক গোষ্ঠী ও এলিট সম্প্রদায় শিক্ষাকে তাদের শাসন ক্ষমতা কায়েম রাখার বিশেষ অধিকার হিসাবে ব্যবহার করে এবং তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখা এবং সেই প্রভুত্ব যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মূল্যবোধকে দীর্ঘস্থায়ী করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।" কোঠারী কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ৫

"এই দিক থেকে বিচার করলে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা—যা সামন্ততান্ত্রিক ও চিরাচরিত সমাজের সীমাবদ্ধতার মধ্যে

একটি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটানোর জন্ম তৈরী হয়েছিল— অবিলম্বে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন, যদি সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের আধুনিকরণের চাহিদা মিটাতে হয়। আর সেই পরিবর্তন করতে হবে—শিক্ষার লক্ষ্য, তার বিষয়বস্তু, শিক্ষণ-পদ্ধতি, পরিকল্পনা, ছাত্রদের সংখ্যা ও উপাদান, শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষক-শিক্ষণ এবং সংগঠন প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের। কার্যত যা প্রয়োজন তা হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব, যাতে করে তা নিজেই একটি খুবই কাম্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করতে পারে।”

কোঠারী কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ৫

“তাই আমাদের মতে সাধারণ মানুষের জীবন, প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার জন্ম চেষ্টা করা এবং তা করে শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যে পৌছানোর জন্ম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলার কাজের চেয়ে অন্ম কোন সংস্কারমূলক কাজই এত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী নয়।”

কোঠারী কমিশন রিপোর্ট—পৃঃ ৬

“বিশেষত প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা (দ্বিতীয়-ভাষা শিক্ষা - সঃ) শিশুর উপর একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি তা শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর তা হলে পড়াশুনার প্রতি এর গোটা মানসিকতাই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। যখন আমাদের মূল উদ্দেশ্যটাই হলো ব্যাপক জনগণকে শিক্ষার দিকে টেনে আনা সেই সময়ে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সামিল হবে।”

কোঠারী কমিশন রিপোর্ট—পৃঃ ১৯৫

“গ্রুপটি (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত ষ্টাডি গ্রুপ ফর দি ষ্টাডি অব ইংলিশ ইন ইণ্ডিয়া—সঃ) এই মতও প্রকাশ করেছে—ইদানিংকালে কতিপয় রাজ্য তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়া শুরু করার পথ গ্রহণ করেছে। এই ঘটনা শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। আমরা এই অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইংরাজির মতো একটি বিজাতীয় ভাষা শিখতে শুরু করার আগে মাতৃভাষায় পর্যাপ্ত দখল হওয়া প্রয়োজন।”

কোঠারী কমিশন রিপোর্ট—পৃঃ ১৯৬

"আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হোক আমাদের দেশে এটা চলিবে না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সবচেয়ে বাধা পাইয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার বাহন

"যে সার্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথায়ও তার সাড়া পাওয়া গেল না।" রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার বাহন

"আমাদের ভরসা এতই কম যে, স্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ।"

রবীন্দ্রনাথ : 'শিক্ষার বাহন'

"সেই সঙ্গে এ কথাও বলা আবশ্যক, অধিকাংশ বাঙালী ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন মুখে বলা যায়?" রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার বাহন

"সেই জন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ, এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।" রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার বিকিরণ

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে সর্বজনস্বীকৃত এই নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ-কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার সাঙ্গীকরণ

"আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালক বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলা সমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্ম কাল বিচিত্ররস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন

আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে: Mamme, Mamme, look, lot of Babus are coming. বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে! তাহাদের শিশু অবস্থায় বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষার সমস্যা

"তেমনি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল।"

রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

"অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়।"

রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

"যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কাঁচা বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় শিক্ষাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেল তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহস পূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির আতপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলা ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।...শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়: সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

"আর সত্যি ভারতবর্ষ বলতে যদি আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশেষ ধ্বনি ওঠে, যদি আমাদের প্রাণ কাঁদে স্বদেশবাসীর জন্য, তাহলে একটি বিদেশী ভাষার দরকার হবে না পরস্পরের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করার জন্য। যে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশীশক্তিকে দেশ থেকে বের করবার জন্য সংগ্রাম করেছিল তারা যখন নিজেরা ক্ষমতা হাতে পেল তখন তাদের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার একটা প্রবণতা দেখা দিতে লাগল।"

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : মাতৃভাষা

"স্বাধীনতার পর দেশে নতুন যুগ এসেছে। কিন্তু বাংলা আনন্দের পরিবর্তে পেয়েছে দুঃখ ও তিক্ততা। সংস্কৃতি ও শিক্ষা দীক্ষায় যে দেশ ছিল এক, তা এখন বিভক্ত হয়ে গেল।" সত্যেন্দ্রনাথ বসু : আমাদের উচ্চশিক্ষা

"মন্ত্রী শ্রমিকদের বারুদের মতো মনে করেন, আর জ্ঞান ও শিক্ষাকে মনে করেন আগুনের ফুলকীর মতো। তিনি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, বারুদে আগুনের ফুলকি পড়লে তাতে যে বিস্ফোরণ ঘটবে, তা প্রথমত ও প্রধানত সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে।" (লেনিন)

"উপরন্তু রয়েছে জীবন-বিদ্যালয়, যেখানে বিরামবিহীনভাবে চলতে থাকে গণশিক্ষা। সেখানে জীবনই হলো শিক্ষক। আর শিক্ষার্থীরা হলো ভিন্নতর জীবন-অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট স্বতন্ত্র বয়স্ক লোকেরা।" (ক্যালিনিন)

"রাশিয়ার জার-পত্নী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ একদা বলেছিলেন, 'অজ্ঞান ও অশিক্ষিত প্রজামণ্ডলীকে শাসন করা সহজতর।' বিশ্বের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রকৃতপক্ষে আজ এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ে। দেখা যায়, যে-সব দেশে জনস্বার্থ বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষা-সংস্থা হতে কোন প্রবেশাধিকার নেই।

(ভি, কুমানেভ)

"পূর্বে বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়োবড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই, আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচাকেনা হইত না।" রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষার বাহন

লেখক পরিচিতি

শ্রীমতী অনিলা দেবী : প্রাক্তন শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের অবিসংবাদি নেত্রী, বিধান পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষক প্রতিনিধি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের সভাপতি।

শ্রীগোলোকপতি রায় : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। বর্তমানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

শ্রীপার্থ দে : অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকার ও গণ-আন্দোলনের নেতা। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)।

ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার : শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাবিদ। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

শ্রীভবেশ মৈত্র : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা। ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার। বর্তমানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বর্তমান সংকলনের সম্পাদক।

ডঃ পবিত্র সরকার : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রবন্ধকার। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের রিডার।

ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকার, নাট্যকার। বর্তমানে একটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী : শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার। বর্তমানে একটি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

ডঃ সমরেন্দ্রকুমার জানা : শিক্ষক, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার। বর্তমানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : শিক্ষক, প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ। বর্তমানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।